শারদীয়া ॥ ১৩৭৭

জঙ্গীপুর সংবাদ

যাঁরা এতে লিখেছেন ঃ

দাদাঠাকুর, শ্রীকালিদাস রায়, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, কুমারেশ ঘোষ, শতদল গোস্বামী, প্রবীর নন্দী, অধ্যাপক স্বরাজ সেনগুপ্ত, ফজলুল হক, শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী, সরোজকুমার ঘোষ, শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, অবনীকুমার রায়, ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিষ রায় ও আরও অনেকে।

পূজা স্পেশাল

কনসেসন

★★
★

প্রতি কেজি ৬·০০

অন্যান্য বাগানের

বাছাই করা পছন্দমত

উৎকৃষ্ট চায়ের

বিপুল সমাবেশ

পূজায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

যে কোন ব্লক তৈয়ারীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

শারদোৎসবে আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন

ফটো তোলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

নন্দী ষ্টুডিও

রঘুনাথগঞ্জ, সদরঘাট

৺পূজায় আপনাদের সাদর-সম্ভাষণ জানাই।

"আলোয় আলোকময় ক'রে
হে এলে আলোর আলো"

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

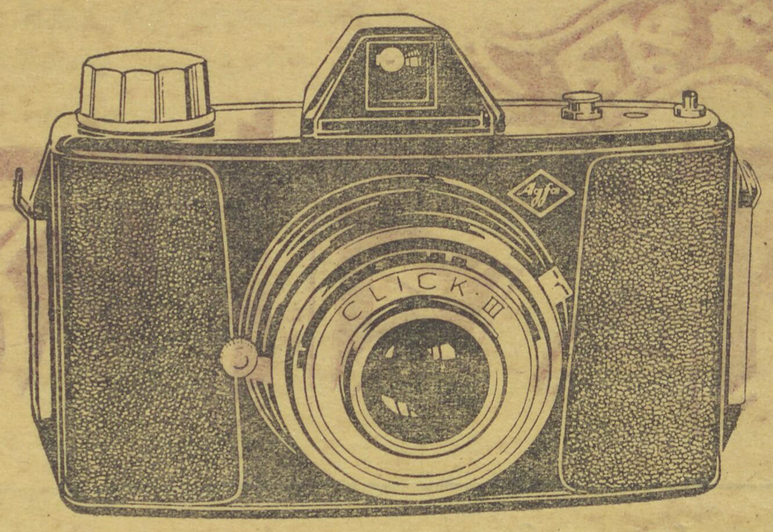

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মহাশক্তির পূজায়
জাতির সুপ্ত শক্তির হোক উদ্বোধন

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে দোরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্যে ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

"যা দেবী সর্বভূতেষু"—

—ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর

বিশ্বের আপাতঃদৃষ্ট নানাত্ব এবং বহুত্বের মধ্যে 'একত্বের' অনুভবই ভারতীয় সাধনার মূল কথা। বেদ এবং উপনিষদের ঋষিগণ এই একত্বকে নানাভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় ঋষির 'দর্শনই' (Realisation),—প্রত্যক্ষ অনুভবই—বর্ত্তমান 'বিজ্ঞান' প্রমাণ করিতেছে। বিশ্বের সমগ্র জড় এবং চৈতন্য বস্তুর—(Matter and energy) পশ্চাতে একটিমাত্র সত্তা-ই বিরাজ করিতেছেন—এই বিশ্বাস বিজ্ঞানদৃষ্টিতে আমাদের নিকট আজকাল অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই একত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যদি আমরা আমাদের প্রাচীন বেদ, উপনিষদ, গীতা এবং চণ্ডীর মর্মার্থ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যাহা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে তাহাই আধুনিক বস্তুবিজ্ঞান স-প্রমাণ করিতেছে। ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সহিত আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সমন্বয় বিশ্বসভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে এক অভূতপূর্ব্ব ঐক্য এবং মিলনধর্মী কল্যাণের পথের নির্দ্দেশ দিতেছে।

বেদের ঋষিগণ বিশ্বের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে 'বহুধা' মূর্ত্তরূপে উপলব্ধি করিয়া অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, ঊষা, রাত্রি ইত্যাদি বিভিন্ন কল্পনায় যেমন উপাসনা করিয়াছেন তেমনি আবার এই সকল দেবদেবীর পশ্চাতে একটি-মাত্র শক্তিই আছেন ইহাও বলিয়াছেন। সৃষ্টির এই বৈচিত্র্য এবং নানাত্ব কিরূপে উদ্ভূত হইল ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন,—

"স দেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ
একমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েতি ॥"—ব্রহ্ম আদিতে এক এবং অদ্বিতীয়ই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন "আমি বহু হইয়া প্রকৃষ্টরূপে (নানারূপে) উৎপন্ন হইব।" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের মন্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে,—

"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি
অগ্নির্যমো মাতরিশ্বানমাহু।"—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম একই। বিপ্রগণ ইহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

বেদের ঋষিগণ সর্বত্র যে 'একব্রহ্ম' শক্তির অস্তিত্ব এবং লীলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন পরবর্ত্তী গীতা এবং চণ্ডীগ্রন্থে সেই শক্তিরই 'একত্বে বহুত্ব' এবং 'বহুত্বে একত্বের' অনুভবের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্য দিয়া অর্জ্জুন উপলব্ধি করিলেন সব দেবদেবী, মানব-দানব, যক্ষ-রক্ষো, কিন্নর-গন্ধর্ব, স্বপক্ষ-বিপক্ষের শত্রু মিত্রগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দেহেরই অংশ বিশেষ। সকলেই এই বিরাট দেহে লীন হইয়া আছেন। অর্জ্জুন আরও বুঝিলেন সকল জীবের জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বিশ্বের সর্বত্র 'একমাত্র' সত্তার অনুভব এবং জন্ম ও মৃত্যুকে একই অবস্থার রূপান্তর জানিয়া মৃত্যুভয়ে ভীত না হওয়াই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার চরম কথা। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্বত্র এই একত্বের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া নিষ্কাম কর্মে প্রণোদিত করিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনের পরই আসিল অর্জ্জুনের যথার্থ শরণাগতি। "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া" সংসার করিলে আসক্তি বা মায়ামোহ ভক্তকে সংসার বন্ধনে দুঃখ দিতে পারে না—ইহাই বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশ। চণ্ডীগ্রন্থেও আমরা ভীত সন্ত্রস্ত শরণাগত দীনার্ত ভক্তের কণ্ঠে প্রার্থনা শুনি "যা দেবী সর্বভূতেষু।"

সংসারতাপ-তাপিত রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি মেধস্ মুনির শান্ত আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারের দুঃখ কষ্ট ভুলিবার উপায় জানিতে চাহিলে মুনিবর তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে দেবী মহামায়ার প্রভাবেই মানুষ সংসার চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে। এই দেবীর শরণাগত হইতে পারিলেই সকল দুঃখের অবসান হইবে। তখন রাজা সেই দেবীর পরিচয় জানিতে চাহিলেন—"ভগবন্ কা হি সা দেবী"—। —কে এই দেবী? সংক্ষেপে মেধস্ মুনি উত্তর দিলেন—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ তথা সর্বমিদং ততম্।" দেবী নিত্যা অনাদি কাল হইতেই তিনি বর্ত্তমান। এই জগতের সব কিছু তাঁহারই মূর্ত্তি সব কিছুতে তিনিই বিরাজিতা। তাঁহার দ্বারাই এই জগত বিস্তারিত বা উৎপাদিত। দেবীর এই বিরাট মূর্ত্তির ভাবনা করিতে পারিলে আমরা দেখিব দুঃখ-দৈন্য শোক-তাপ সব কিছুর মধ্যেও তিনিই। তাই মহামুনি মেধস্ রাজা সুরথকে উপদেশ দিলেন :—"

"তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগ স্বর্গাপবর্গদা॥"—হে মহারাজ, আপনি তাঁহার শরণাগত হউন। তাঁহাকে আরাধনা করিলে মানুষ ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করিয়া থাকে। মহারাজ তাহাই করিলেন এবং দেবীর কৃপায় মনের শান্তি ও অভীষ্ট লাভ করিলেন। সমাধি বৈশ্য কিন্তু আর সাংসারিক সুখ প্রার্থনা করিলেন না তিনি একেবারে মুক্তি প্রার্থনা করিলেন এবং তাহাই লাভ করিলেন।

অপার করুণাময়ী মা "চিত্তে কৃপা" ধারণ করিয়াও বিপথগামী সন্তানের শাসনের জন্য "সমরনিষ্ঠুরতা"ও প্রদর্শন করিতে পারেন। সৃজন-পালন-নিধনরূপিনী এই মায়ের শরণাগতিই আমাদের দুর্গা পূজার উদ্দেশ্য। রাজা সুরথ আর সমাধি বৈশ্যের ন্যায় আমরা সংসার পীড়ায় পীড়িত। আবার মাতা চণ্ডীর রুদ্ররূপ রোগ, শোক, মহামারী বিপ্লব-প্লাবনেও আমরা ভীত। বাঙ্গালী সাধক মায়ের এই ভীষণ-মধুর কোমল-কঠোর রূপের সহিত পরিচিত। তাই মায়ের রুদ্ররূপেও সে ভীত নয়। শত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আগমনীর সুর বাজিয়া উঠে। পূজার মণ্ডপে ঢাক-ঢোলের বাদ্যের মধ্যে সমস্বরে ভক্তকণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়া উঠে—

"শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।"

মরণ তোমার জীবন হ'য়ে আসবে ফিরে

—শ্রীকালিদাস রায়

বাড়ীর পাশে পচা ডোবা বাঁশের পাতা পচছে তায়,
জঙ্গলেরে বাগান বল শুনে মোদের হাসিই পায়,
কোথায় তোমার জাতি যূথী ?
সিদ্ধি, কচু, আশ-শেওড়া, কালকিসিন্দা, জলবিছুতি,
গ্রাম জুড়ে রয় সাপের ডেরা,
মাছের আঁইশ, পচা আনাজ, ভাঙ্গা হাঁড়ি নেকড়া ছেঁড়া,
এঁটো পাতা, মরা ইঁদুর, ঝড়া পাতা,
মড়ার বালিশ, রোগীর কাঁথা,
হেথায় হোথায় জমে' আছে। পুকুর পাড়ে
এমন বিশ্রী নোংরা জিনিস কলম তাহে লিখতে নারে।
ঐ পুকুরের পানার তলে,
বাঁশের সঙ্গে পাটের বোঝা পচে এবং পচায় জলে,
উঠানে দাও বৃথায় এত আলিপনা,
লক্ষ্মী তাতে আসবে ত না,
বাড়ীর পাশে প'ড়ো ভিটেয় জমছে যত আবর্জনা—
সারকুড়েতে পচা ছানি, পচা গোবর, ছাইএর রাশ
গন্ধ ছড়ায় বারোটি মাস।
ওদের মাঝে মরণ আছে, জীবন আছে অন্যভাবে
জান্‌লে নিতে ওদের মাঝেই জীবন পাবে।
হবে ওদের নিঃশেষে ভাই চালান দিতে
যেথায় তোমার ফসল ফলে সেই জমিতে।
লোকালয়ে একটি দিনও দিও না ঠাঁই, ওরাই সার,
ত্যজ্য তোমার, ভোজ্য ওসব ভূমিমাতার।
নূতন জনম পাবে ওরা শস্য ক্ষীরে
মরণ তোমার জীবন হ'য়ে আসবে ফিরে—
তাড়িয়ে দেবে অলক্ষ্মীরে
অম্লজানে গ্রহণ ক'রে দিই যে বিষবাষ্প ছাড়ি
তাহাই পিয়ে তরুলতা বারংবারই,
জীবন-বায়ু দিচ্ছে ফিরে, দিচ্ছে জীবন শস্য ফলে
দয়াল বিধির বিধান বলে।
বিষের বোঝা জমতে যদি না দিই ঘরে,
সঁপি ভূমিমাতার করে,
ভূমিমাতাও বিষকে সুধায় পরিণত
ক'রে মোদের ফিরিয়ে দেবে অবিরত।
লোকালয়ে রয়ে যারা জীবন হরে,
ক্ষেতে গিয়ে তাহাই তোমার জীবন গড়ে।
ক্ষেত্রমাতার স্তন্য সুধায় বুক ভরুক,
আশীর্ব্বাদই অভিশাপের রূপ ধরুক।

আহ্বান

—শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ঐ-শোন গো ভারত মাতঃ কত হাহাকার
রুদ্ধ কণ্ঠে নিকণিত আর্তের ক্রন্দন।
বুভুক্ষু সন্তানগণ ফিরে দ্বারে দ্বারে
এক মুষ্টি অন্ন লাগি করিছে রোদন ॥

শহীদ শোণিতসিক্ত রিক্ত ধরাতলে
ছিন্ন করি এসেছিলে সহস্র শৃঙ্খলে।
দুঃখ শোক তাপ সবই ভুলেছিনু মোরা
নেহারি সহাস্য হাস্য শোভা শতদল ॥

কোথায় সেদিন আজি শুধু স্বপ্ন সম
ব্যর্থ হয় সব আশা তিল তিল করি।
চারিদিকে মদমত্ত পিশাচের দল
স্বার্থ সিদ্ধি তরে ঘুরে যোগী বেশ ধরি ॥

তুমি তো আনন্দময়ী অসুরনাশিনী
আনন্দ দানিতে মর্ত্ত্যে তব আগমন।
ক্ষুধাতুর রুক্ষকেশ জীর্ণ বেশ ধারি
তোমার সন্তানগণে কর নিরীক্ষণ ॥

বিরাজ জননী তুমি সর্বজীব মাঝে
তুমিই সহস্রবার বর্ণিলে বেদেতে।
কেন বা কুবুদ্ধি দানি সন্তান মানসে
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখ গোপনেতে ॥

শেষ রজনীর সিক্ত শ্যাম শষ্প পরে
ঝড়া শেফালিকা পুষ্পে লইতে অঞ্জলি।
আসিতেছ মর্ত্তধামে তুমি কৃপাময়ী
ত্যজি অজে লইবে মা দানবের বলি ॥

কবিতা

বরং উমা ফিরে যা মা

(সু—মো—দে)

(১)

নিরাপত্তার অভাবে মানুষ
নাস্তানাবুদ নাইক ঠাঁই,
কোথায় তোকে রাখবো মা গো
এই ভাবনায় কূল না পাই।
ভোট ভাঁওতার অনেক বাকী
শুনছি চোখা ভাষণ বাত,
প্রার্থী জানায় ভোটার পাবে
আসমানী চাঁদ কাপড় ভাত।
এবার পূজায় নাস্তানাবুদ
থরহরি কম্পমান,
দাবীর চোটে খাচ্ছি খাবি
অভাব জ্বালায় ছাড়বে প্রাণ।
মেয়ের বাড়ীর পূজার তত্ত্ব
প্রতি বছর দিতেই হবে,
পান হইতে চূণ খসিলে
গালি মন্দ বেয়ান কবে।
ছেলের দাবী ড্রেন-পাইপ-প্যান্ট্
পয়েন্টেড্-সু পূজায় চাই,
পাঁচটি মেয়ের রোলেক্স শাড়ী
টপলেশ জামা কোথায় পাই ?
গিন্নীর দাবী গরদ শাড়ী
বড় বাবুর বৌএর মতো,
পাড়ার চাঁদা দশটি টাকা
দাবীর কথা বলবো কতো ?

(২)

বরং উমা ফিরে যা মা
বিপদগ্রস্ত হতবাক্,
টুইস্ট্ তাশা মাইক উৎপাত
এ বছর মা বন্ধ থাক।
প্রণাম জানাই দুর্গা দেবী
বিপর্য্যস্ত পরিবেশে,
কর্ মা আশিস্ আর না আসি
স্ব স্ব প্রধান বাংলা দেশে।

শঙ্খবাজে

অধ্যাপক—স্বরাজ সেনগুপ্ত

বুকের ভিতর শঙ্খবাজে।

নদীর শরীরে
তলোয়ার সূর্যরেখা।
ত্বকে, কোষে, ঘ্রাণে,
অসহ উত্তাপ—
শঙ্খচূড় ফণা তুলে নাচে।

বুকের ভিতর শঙ্খবাজে।
অমিতার বুকের উপর
প্রশান্তির চিতা;
তবু প্রেম—আষাঢ়-শ্রাবণ!
মৃত্যুর আঁধারে
ঘুণের শরীরে
মাদল সঙ্গীত—
অট্টহাস্য;
ভাঙা দেবালয়।
সোনার হরিণ প্রাণ ছায়া দেখে হাসে
বুকের ভিতর শঙ্খবাজে।

জীবনটা

—কুমারেশ ঘোষ

জীবনটা কি?
বন্ধ ঘরে চড়াই পাখির ডানা ঝাপটানো।
কিংবা খোলা দরজায় না ঢুকে
ধাক্কা দেওয়া, যে দরজা আটকানো।
জীবনটা কি?
স্রেফ ভুল আর ভুল!
এবং গুল্!
অথবা বেঁটে মানুষের গায়ের জামা
যার হাঁটু-ছাড়ানো ঝুল!
বলবো কী রে দাদা!
চারিদিকেই মধুর চাক,
অথচ হাত বাড়ালেই হুল্!!

এসো মা জননী

—শ্রীকিশোরী মোহন নস্কর

এসো মা দুর্গা জগজ্জননী
কলুষহারিণী হে মহামায়া,
অসুর ধ্বংসকারিণী দেবী
ভক্ত জনের দে পদ ছায়া।
দুর্গত আজ সারাটা বঙ্গ
তবুও দেখি যে কত না রঙ্গ
করিনা আমরা সাধুর সঙ্গ
অসহ দুঃখে পড়েছি তাই,
অন্নপূর্ণা অন্ন দাও মা
ঘরেতে মোদের অন্ন নাই।
বন্যায় ভাসে বাংলা দেশ
সোনার ফসল হয়েছে শেষ
তব আগমনে সকল দুঃখের
হোক চির অবসান,
দুষ্কৃতদের দমন করিও
সাধুদের কর ত্রাণ।

শারদীয়া মহাপূজার অবকাশ

'জঙ্গিপুর সংবাদে'র গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপন-দাতাগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন—আমরা বর্ত্তমানে আমাদের প্রাপ্য দুই সপ্তাহের অবকাশ না লইয়া সময়ান্তরে গ্রহণ করিব।

সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

OPEN পত্রে গোপন কথা

সপ্রণাম নিবেদন—

মায়ের অসুখ, খোকাখুকী ভাল নাই। ওষুধগুলি এনো, পাছে ভুল হয় ব'লে ছড়া ক'রে দিলাম।

জয়মঙ্গল রস—খুকীর জ্বরে করবে গুণ,
বাসারিষ্ট এনো—খোকা কেসে হচ্ছে খুন।
কুটজাসব এনো—মায়ের রক্ত অতিসার,
সুরবল্লী-কষায় এনো—ঢাকতে আমার হাড়।
মকরধ্বজ সি, কে, সেনের—ভেজাল কিছু নাই,
তেজস্কর ওষুধ এটা—নাইকো পাড়াগাঁয়।
লইবে আর এক দ্রব্য—এঁদের নিকটে,
আছে কিনা আছে দেখি—বুদ্ধি তোমার ঘটে।
নিয়ে এসো প্রায় তা' তুমি—লিখছি শুধু কেন।
বে-আদবী হলো বুঝি—রাগ ক'রোনা যেন।

সেবিকা—শ্রীমতী।

এবার পূজায়

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিণ্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র সুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী, টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুন্দ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

শারদীয় সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের

মনের মত ভাল বই

সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

কাল-বৈশাখীর পণ

এই অসীম, অনন্তলোকে,
হে রুদ্র, তোমার মঙ্গলালোকে,
হোতে আমি চেয়েছিনু অপার উদার—
নিয়ে মোর চিত্তের সকল সম্ভার!
কিন্তু কেন জানি—এ নিখিলের
শূন্য হাতছানি—
নিয়ে গেলো মোরে টানি,
সে কোন বিশ্বলোকে—
যেথা হতাশার, ব্যর্থতার নিঃশ্বাস
করে পরিহাস
যত লোভনীয়—মনোহর আশ্বাসে।
তাই আকাশে, বাতাসে সদা শুনি
লোভী কামাতুরের নিত্য কানা-কানি।
সেথা, কালো-রাত্রির বলদর্পী বণিক, সে লুঠেরা—
লুণ্ঠন করে সে নিত্য মানুষের ন্যায্য ভোগের পসরা।
দিবসের প্রখর আলোয়,
গায়ে তার সমাজ-সেবীর নামাবলী—
মানায় ভাল-ই।
তারই কৃপা-মুষ্ঠি হোতে নিক্ষেপিত খানিকটা পণ্য
প্রকাশে মোদের অন্তরের কি নিঃসীম দৈন্য!
হে ভৈরব, তব রুদ্র রোষানল মাগি—
কৃপা-মুষ্ঠির এই কিঞ্চিতের লাগি
বঞ্চিতের সেকী হানাহানি—
সাগর-মন্থন শেষে লোভিতে যথা মোহিনীর পাণি।
তাই দেখি, কালোরাত্রির ধনিক, বণিক-বিলাসী
অন্তরের গোপন উল্লাসে ওঠে সদা উল্লাসী।
এই গোপন উল্লাসের তীব্র দহনে দহিতে, দহিতে—
নিত্য আত্ম-অবমাননা সহিতে, সহিতে—
আমি কি শব? নহি শিব-রুদ্র ভয়ঙ্কর?
না, না, না—
এ অবমাননা, আর সহিব না।
আকাশে-বাতাসে আজি বাজিছে বাজনা,
ঝানা-নানা-নানা—প্রলয়ঙ্কর।
দিগ্-দিগন্তে গরজি উঠিছে আজ প্রলয়-ডঙ্ক
জাগিয়া উঠেছি আমি—
শিব নিঃশঙ্ক—
বাজাও ভেরি—বাজাও শঙ্খ
অশনি ভীম ঝঞ্ঝা সম করি লণ্ড-ভণ্ড—
আমিই রচিব আজ নবীন ব্রহ্মাণ্ড।

জিতাষ্টমী, ১৩৭৭। —সরোজকুমার ঘোষ

শরৎ এলো

—ধুর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ এলো
সিনান করি
বরষা জলে,
মেঘমেদুরা
ওড়নাখানি
আজকে ফেলে।
নীল গগনে
বিছিয়ে দিয়ে
উত্তরীয়
পুলক ভরে
সঙ্গে নিয়ে
শ্যাম-অমিয়।
শরৎ এলো
হরষ নিয়ে
হৃদয় ছেয়ে,
ছড়িয়ে হাসি
খুশির রাশি
দুকুল বেয়ে।
সদ্য স্নাতা
সাজলো ধরা
নূতন বেশে
যৌবনেতে
পড়ছে লুটি
আকুল হেসে।

শরৎ রবি
ছড়িয়ে তারি
কিরণ ধারে
সরিয়ে দিল
বদ্ধ যত—
অন্ধকারে।
ফুলের বনে
নিমেষ হারা
অলির দল,
শরৎ এলো
সম্ভাষণে
সচঞ্চল।
শিউলি তারি
বৃন্ত খসি'
পড়ছে লুটি;
পদ্মজাগে
মুখটি তুলে
পাপড়ি টুটি'।
শুভ্রা বেলী
আপন মনে
জাগছে ধীরে
গোলাপ ফুটে
রঙিন হয়ে
বৃন্ত ঘিরে।

শস্প শিরে
চিক্ চিকে ঐ
শিশির কণা।
অরুণ আভায়
মুক্তা পাতি
যাই না গণা।
সবুজ কালো
চিকণ ঘাসে
লাগলো দোলা
মেঠো বায়ুর
শরৎ দিনে
মন উতলা।
উষার আগে
নিদ্রা ত্যজি
কূলার পরে,—
গাইছে পাখী
শরৎ গীতি
হৃদয় ভ'রে।
দশদিশি ঐ
নূতন সাজে
রূপ সাজালো,
হরষ নিয়ে
বরষ পরে
শরৎ এলো।

শ্রীঅরুণ
কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রম্যরচনা

॥ একজন আঁতেল-উন্মাদ ও চার খরিশ ॥

—প্রবীর নন্দী

পাগল নানা ধরণের হয় - পথে-ঘাটে : ফুটপাতে, দোকানের সামনে কিংবা বাসষ্ট্যাণ্ডে প্রায়ই তাদের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের। এইসব তথাকথিত পাগলদের বাদ দিলে, আরও কত যে পাগল দুনিয়ায় আছে, তার কোন হিসেব-নিকেশ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর পাগলামী আছে এবং প্রায়ই আমাদের পরস্পরকে 'পাগল বলে অভিহিত করতে বাধে না'—সংবাদ ভাষ্যের ধাঁচে এই পর্য্যন্ত লিখে আমাকে থেমে পড়তে হল, কেননা একজন আঁতেলের গপ্পই বলতে বসেছি আমি—এখন উন্মাদ জগতের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজেই না উন্মাদ প্রমাণিত হই, এ আশঙ্কা আছে। সে যাই হোক, একজন তথাকথিত পাগলের মনোবীক্ষণে দুনিয়ার আসল চেহারাটা কেমন শুনুন : দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশিষ্ট দার্শনিকটির মতে—'পাগল তো সবাই—ভাঁড় থেকে কলসী সকলেই'! লোকটি আরও বলেছিলো যে "চায়ের দোকানের 'পালা বোষ্টম'-ই একমাত্র মানুষ, আর সবাই খেপচুরিয়াস্—" বলা বাহুল্য যে তার মর্‌নিং এবং তৎসহ ইভ্‌নিং 'টি' ওখান থেকেই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত।

এবার গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল গপ্পে আসা যাক। একবার 'এ্যাকাডেমী'তে (অ্যাকাদেমী অব ফাইন আর্টস্ : কলকাতা) আমাদের 'ড্যান্স ড্রামা' 'চিত্রাঙ্গদা' হবে, সেই উপলক্ষে অনেক রাত্রে দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার লাগাতে বেরিয়েছি…আমরা চারজন—আমি, আকাশ, সুনীল ও মনুজেন্দ্র। আকাশ আগে আগে চলেছে। মনুজেন্দ্র মাঝখানে। আমি ও সুনীল একসঙ্গে। আমার হাতে আঠার বালতি। মনুজের হাতে পোষ্টার। সুনীল নিয়েছে মই। আকাশ চলেছে গুন গুন করতে করতে 'না, না, না, সখী ভয় নেই, সখী ভয় নেই !…… '

সেদিন শুক্লা পঞ্চমী……কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গেছিল, জল জড়িয়েছিল দেওয়ালে : সদানন্দ রোডের ফ্লুরেসেণ্ট-লাঞ্ছিত পথে আমাদের অভিযান হঠাৎ থেমে পড়ল এক জায়গায়। বাঁ-হাতি গলিটা পেরোতেই দেখা গেল একটা লোক দাঁড়িয়ে : আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দু-টো ঠ্যাং ফাঁক করে বরফি-সন্দেশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

ফাঁকা রাস্তা, একটা কুকুরও দেখা যাচ্ছে না আশে-পাশে ; এত রাত্তিরে লোকটা করছে কি ? …. যেতে যেতে গান থামিয়ে আকাশ বলল 'পাগল'! আমি পাগল দেখলেই মজা পাই আর তাছাড়া…আমার একটা অন্য উদ্দেশ্যও ছিল…যথাস্থানে পাঠক তা' বুঝতে পারবেন—

তারপাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে থেমে, আমি বললাম 'এই যে শুনুন'! —'কি বলুন'! এগিয়ে এল লোকটি : রোগা-বিষণ্ণ, একগাল দাড়ি—আধ বোঁজা চোখে চেয়ে আছে, যেন জেগে আছে কি ঘুমিয়ে আছে, বুঝতে দেবে না।

বললাম—'কি করছেন এত রাত্তিরে' ?

—'বাড়ী যাচ্ছি'!

—কোথায় বাড়ী ?

—পোষ্ট অফিস্!

—পোষ্ট অফিস !! কোন পোষ্ট অফিস ?

—নক্ষত্রবাড়ী !

আমি বললাম—সে কি, নক্ষত্রবাড়ী আবার পোষ্ট অফিসের নাম হয় নাকি ? পাগল বললো—কেন হবে না, 'সিগনেট কুমার' যদি ফিল্ম্‌ষ্টারের নাম হয়, তাহলে ……? বলে সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু চোখে অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে রইলো, চোখদুটো তখনও তেমনি আধবোঁজা।

—'আপনার নাম কি'?…মই বেয়ে সুনীল তখন পোষ্টার লাগাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে পাগল বললো— 'চিত্রাঙ্গদা'…অ্যাকাদেমী অব্ ফাইন আর্টস…শেষের দিকে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল—'শান্তি মিত্র'! বলা বাহুল্য যে আমাদের ড্যান্স ড্রামা পরিচালনা করবেন 'শান্তি মিত্র,' অথচ পাগলের নামও 'শান্তি মিত্র,' এ হ'তেই পারে না! আমি ধমকে জিজ্ঞাসা করলাম—'আমার কথা শুনছেন' ?

—আলবৎ, জরুর্, বলে পাগল হুঙ্কার দিয়ে উঠল, তারপর যেন জলের অতল থেকে কথা বলছে,—ফিসফিস করে বলল—'আমার নাম নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য,' থুরি 'লোপামুদ্রা'! লোপামুদ্রা এবং নকুলেশ্বর-এর মধ্যে একটা রোম্যান্টিক সেতু খাড়া করবার চেষ্টা করছি, আকাশের দিকে চেয়ে পাগল বলল—'লোপামুদ্রাকে চেনেন'! ..হুঁ-হুঁ বাবা…… মেজদা'র সঙ্গে চালাকী! দু'-দুটো বন্দুক! তারপর ?……চোখ কপালে তুলে সেই প্রাগুক্ত ভঙ্গিমায় পাগল চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। আমরা হাসতে লাগলাম মজা পেয়ে। ফের বলল পাগল, 'এটা সিক্সটী-নাইন্ না ? আমরা ঘাড় নারলাম।—তাহলে…আন্তিগোন এলো না যে !! খুব চিন্তিতভাবে মাথা নাড়তে লাগল পাগল 'তব্বে এটা সিক্সটী-নাইন না !

কিছুক্ষণ বিরতি। আমরা পাগলকে ছেড়ে পোষ্টার লাগাতে ব্যস্ত। চেয়ে দেখি পাগল অন্যমনস্কভাবে দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে। ফ্লুরেসেণ্ট আলোয় একটি প্রেতমূর্তির মতো……প্রায় চোখ বুঁজেই…… খান চারেক পোষ্টার লাগানো হলে মই ঘাড়ে করে সুনীল প্রস্থানোদ্যত হতেই আমার প্ল্যানমতো কাজ শুরু হলো। কাছে গিয়ে পাগলকে বললাম—'আপনি একটু আমাদের হেল্প করবেন' ? হাসি হাসি মুখে চালাকীর ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে পাগল বলল—'না করতেও পারি' !……হুঁ-হুঁ বাবা…মেজদার সঙ্গে চালাকী !!…… ' আর যাই

হোক এই মেজদা' নামক ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল আজও বর্তমান, মনে হয় এই একটি মাত্র ব্যক্তিই সহস্রতম হয়ে তাড়না করে চলেছেন পাগলকে। অতএব মেজদা'র সংগে আর চালাকী চলবে না ভেবে এ্যাবাউট-টার্ণ করব কিনা ভাবছি, পাগল আমাদের আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন·· ···ডাবলিন্' ? ঝটিতি উত্তর করলাম—'না, বুয়েনাস-আইরেস্'।

—'যাক্ বাবা···বাঁচা গেছে তাহলে···চলুন···চলুন···বলে বীরদর্পে মার্চ করার ভংগীতে পাগল চললো—সুনীল মইটা ওর কাঁধে চাপিয়ে দিল, আমি দিলাম আঠার বালতি শুধু মনুজেন্দ্র বিরস মুখে পোষ্টার হাতে চলল। পাগল চলেছে·····ছেঁড়া ময়লা রেইন কোটটা গায়ে, মাথার চুলগুলো জট পাকিয়ে ভ্যান-গগের আঁকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কুঁকড়ে আছে। আকাশ বললো—থাম এখানে : পাগলের হাত থেকে মই নিয়ে সুনীল উঠে গেল দেওয়ালে, ফ্লুরেসেন্ট আলোয় ফাঁকা নিশুতি রাতে আমরা তিনজন আবছা ছায়া ফেলে নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাগল বলল—'ফুলুরিজংশনটা কোথায় বলতে পারেন'? আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম তার দিকে। আকাশ বলল 'গৌহাটীতে'! : 'বাঃ! বাঃ···তোফা হবে,' বলে হাততালি দিয়ে একপাক নেচে ফেলল পাগল তারপর আমার দিকে ফিরে আহা! সেগুন কাঠের পুডিং আসবে ওখান থেকে, জানো, মা খুব ভালবাসতো! আমি বললাম—'কী'?

—'কাঠবেড়ালী ····স্কুইরেল্'। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতে আমরা থামলাম, চেয়ে দেখি সামনের তিনতলা বাড়ীর দিকে দূরবীন কষার ভংগীতে চেয়ে রয়েছে সে ····ওরাং-ওটাং-এর মত ঈষৎ নত হয়ে। কিন্তু মিনিট-দুইও কাটলো না, হঠাৎ নিশীথ রাতের নৈরাজ্যকে কাঁপিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—'এ-ই! ওখান থেকে ঢিল মারছিস কে রে? ····মেজদা'র সংগে চালাকী!·····মেরে ছাতু করে দেব·····' আমরা হতচকিত—মনুজেন্দ্র ফিসফিসিয়ে বলল—'পাগলটাকে ছেড়ে দে, যা আরম্ভ করেছে'! ·····

খানিক বাদে···সুনীল উঠে চতুর্থ পোষ্টার লাগাচ্ছে, হঠাৎ পাগলের চোখ সেদিকে পড়ল—'কে বাবা উমিচাঁদ ?·····হ্যাঁ-হ্যাঁ পয়সা আমাদের সকলের আছে·····' ওসব আর কাউকে দেখিয়ো। তারপর আমার দিকে ফিরে (আমাকে খুব চিনেছে) ·····'জানো, আজকাল না মানুষের মন-টন নেই'!—'তোমার আছে'?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ···জরুর্ ··মন মানে ফুস্‌ফুস্—চার-চারটে মন—চার-চারটে ফুস্‌ফুস্, বলে সে অনেকক্ষণ ধরে ফুস্‌ফুস্ ·····ফুস্‌ফুস্ করতে লাগল।

আকাশ বলল—'আজকে খেয়েছ'?

—হ্যাঁ····· দারুন খেয়েছি·····আজকে না কত সব···যে···বিড়বিড় করতে লাগল পাগল, এরপর সুনীলের দিকে তাকিয়ে—'আরে·····নামিস্ না বেইমান!·····নামিস না বলছি'! নিমেষে পাগলের গলা গম্‌গম্ করে উঠল·····সুনীল থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মই-এর ওপর ··। আমরা হাসতে হাসতে অভয় দিয়ে বললাম —'ভয় নেই·····নেমে আয়—'

সুনীল নেমে আসতেই মনুজ ধমকে বলল—'অত চেঁচাচ্ছিলে কেন, মই থেকে যদি পড়ে যেত'! পাগল বলল—'পড়ে গেলে প্যাগোডা হয়ে যেত'।

ভোর বেলায় চা-বিস্কুট খাইয়ে আর আট আনা পয়সা দিয়ে পাগলকে বিদেয় করলাম। যাবার সময় সে বলল—'গুড্ বাই, লোপামুদ্রার কাছে যাচ্ছি : ফুলুরিজংশন ·····হুঁ-হুঁ বাবা—মেজদা'র সংগে চালাকি !!

—দু-দুটো বন্দুক·····'

মোক্তারের পূজোর শিকার

—দাদাঠাকুর

দীনদয়াল মুন্‌শী সেকালে ছাত্রবৃত্তি পাশ মোক্তার। রেভিনিউ এজেন্টের পাট্টাও তাঁর ছিল। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আদালতে তাঁহার গতায়াতের সুবিধা ছিল। মুন্‌শীজী মামলার সৃষ্টি করতেও পারতেন বলে তাঁর সুনাম বা দুর্নাম ছিল। মহকুমা-শাসক বদলি হবার সময় মহকুমার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য রেখে যান। তাই দেখে তাঁর পরবর্ত্তী শাসক সকলের দোষ গুণের বিষয় ওয়াকিফহাল হ'তে পারেন। প্রবীণ মোক্তার দীনদয়াল মুন্‌শীর নামে পূর্ব্ববর্ত্তী মহকুমা-শাসক যে নোট রেখে গেছেন, বর্ত্তমান শাসক তা' দেখে জান্‌লেন ইনি মিথ্যা মামলা তৈরী ক'রেও টাকা রোজকার করেন। বিশেষ ক'রে পূজোর পূর্ব্বে প্রত্যেকবার এই জাতীয় মামলার সাহায্যে মোটা টাকা রোজকার করা তাঁর অভ্যাস।

একদিন মহকুমা-শাসক খাস কামরায় একাকী বসে আছেন, এমন সময় মুন্‌শীজী উপস্থিত হলেন। হাকিম বাবু একটু মুচকি হেসে, মুন্‌শীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দীনদয়াল বাবু, পূজো তো নিকট, এবার শিকার পাকড়ালেন কাকে ?"

দীনদয়াল—হুজুর ধর্ম্মাবতার, গরীবের মা বাপ, হুজুর থাকতে আর কাকে পাকড়াব, হুজুরের দয়া পাকড়ে পড়ে আছি, তাতেই মোটা ভাত মোটা কাপড় হয়।

হাকিম—দীনদয়াল বাবু, স্পষ্ট জেনে রাখুন, আগেকার মত শিকার পাকড়াতে গিয়ে, যদি পাকড়া যান, আমার হাতে নিস্তার নাই।

দীনদয়াল—জানি ধর্ম্মাবতার। হুজুর কুলীন কায়েতের ছেলে। আমি বাহাত্তুরে। আসি হুজুর। তিন কাল গিয়ে এক কাল বাকি। অদৃষ্টে যা আছে হবে।

হাকিমের খাস কামরা হ'তে বেরিয়েই মুন্‌শীজী দেখলেন কোর্টের দারোগার ঘরের রোয়াকে এক বিরাট মোশ্লেম জোয়ান এক কাঁদি ডাব কাঁধে নিয়ে। তার কোমরে দড়ি বেঁধে, সেই দড়ি ধরে আছে এক প্রকাণ্ড দেশোয়ালী কনষ্টেবল। দীনদয়াল বাবু এক নজরেই বুঝলেন—ব্যাপারখানা কি। তিনি আসামীর কাছে যেতে-না-যেতেই দেখলেন, আসামীর বৃদ্ধ পিতা খোসবর অন্য একজন মোক্তারকে ১টি টাকা দিচ্ছে। মুন্‌শীজী বুঝলেন মামলা তাঁর হাতছাড়া। মুন্‌শীজী মনে মনে ফন্দী আঁটলেন পানি না ছুঁয়েই মাছ ধরতে হবে। আসামীর বাপের সামনেই তার নিযুক্ত মোক্তারকে মুন্‌শীজী দাতব্য পরামর্শ দিলেন—এ কেস খালাস তো হবেই না, আসামী খুব বলিষ্ঠ, ঘা বিশেক বেত মেরে ছেড়ে দিবে। তখন আম চুরি, জাম চুরি, কাঁঠাল চুরি মামলায় বেত্র-দণ্ডের চলন ছিল। কাছারীর ময়দানে খ্রীষ্টানদের ক্রশের মত কাঠের আসামী বাঁধা ক্রশ থাকতো। মাটি হতে লম্বভাবে যে অংশ তাতে বুক কোমর পা বাঁধা হতো, মাটির সঙ্গে সমান্তর অংশে ডান হাত ও বাঁ হাত বেঁধে, পরণের কাপড় কোমরে গুটিয়ে সারি সারি বেত্রাঘাত করা হতো যেন এক আঘাতের উপর আর এক আঘাত না পড়ে। বেত মারার পূর্ব্বে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করা হতো, যে আসামী হুকুমমত বেত্রাঘাত সহ্য করতে পারবে কিনা। আসামীর সহ্যের বাইরে হ'লে, যত ঘা সইতে পারে, তত ঘা মেরে বাকি আঘাতগুলি আস্তে আস্তে হাতের চেটোতে মেরে "হাকিম ফিরে তো হুকুম ফিরে না" কথার সার্থকতা রাখা হতো। দীনদয়াল মুন্‌শীর দাতব্য পরামর্শ মেনে নিয়ে, মোক্তার খোসবরের পুত্র আসামী দিলদারকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করালেন। প্রবীণ মোক্তার দীনদয়ালের অনুমান মত ২০ ঘা বেতেরও হুকুম হলো। স্নেহময় বাপজান খোসবর হুকুম শুনে কেঁদে উঠে দীনদয়ালকে ধরে বল্‌লে—বাবু, আমার দিলু কাল রাত হতে কিছু খায়নি, বাছা আমার খালি পেটে ২০ ঘা বেত খেয়ে মরে যাবে। দীনদয়াল মুন্‌শী গোপন স্থানে ডেকে চুপিচুপি আসামীর বাপজান খোসবরকে বল্লেন—খোসবর তোমার দিলদারকে বেত মারা হবে ৩টা ৪টার আগে নয়। ডাক্তার মরা কাটা ঘরে লাস কাটছে, কাজ সেরে, বাসায় এসে স্নান আহার করে আসবে সেই বিকেল বেলায়।

খোসবর মুন্‌শীজীর পায়ে ধরে বল্‌লে "বাবু আপনাকে আমি খুশী করবো, আমার বাছাকে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।" মুন্‌শীজী বুঝলেন—ওষুধ ধরেছে। তিনি খোসবরকে ভরসা দিলেন—যদি ১০৲ টাকা দিতে পার তোমার দিলদারকে পেট ভরে পুরি মিঠাই খাইয়ে বেত খাওয়ার মত তাকৎ এনে দিব। আর যদি নগদ ১০০৲ টাকা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এনে দাও, তোমার দিলদারের বদলে অন্য লোককে বেত মারার ব্যবস্থা ক'রে দিব, দিলদার খোস মেজাজে হাসতে হাসতে মোকামে ফিরে যাবে। আসামীর বাপজান বৃদ্ধ খোসবর যেন ডুবন্ত নৌকার হালে পানি পেয়ে ছুটলো বাড়ী। আধ ঘণ্টার মধ্যে নোটে, টাকাতে, রেজকীতে ১০০৲ একশো টাকা এনে দীনের বন্ধু দীনদয়ালের হাতে চুপি চুপি দিয়ে বল্‌লে—যদি আমার দিলু আজ রাতে বেদাগ মোকামে ফিরে, কাল ভোরে আপনার বখ্‌শিশ আর ১০০৲ টাকা আপনার কাছে হাজির করবো। পণ্ডিতরা বলেন—"ধনেন বলবান্ লোকে ধনাৎ ভবতি পণ্ডিতঃ।"

নগদ একশো টাকা ও আরও একশো টাকার ভরসা দীনদয়ালের বুদ্ধির দরজা খুলে দিয়ে তাতে বিজলী বাতির রোশনাই ক'রে দিল।

মুন্‌শীজী কোর্ট দারোগার হাজতে আসামীর পাহারাওয়ালা দেশোয়ালী সিপাইকে নগদ ৫৲ পাঁচ টাকা দিয়ে বললেন—দোবেজী, এই নেন আপকা সেলামী। আসামী পায়খানায় যাবে বলে হাতে হাতকড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘরের পেছন দিয়ে হালুয়াইএর দোকানে নিয়ে চলুন। ও কিছু খেয়ে নিক, আপনিও পোরী মিঠাই খেয়ে নিন। নগদ পাঁচ টাকা আর পোরী মিঠাইএর লালচ দোবেজীর মুখে নীতিবাক্যের সঞ্চার করলো—"রামজী দেনেবালারে, গুরুজী দেনেবালা।" কোর্ট বাবুর হুকুমের দরকার হলো না। নিজেই আসামীকে হাজতের পিছন দিক দিয়ে হালুয়াইএর দোকানের পিছন দিকে হাজির করলো। দীনদয়ালের অনুরোধে আসামীর খাওয়ার অসুবিধা হবে বলে হাতকড়ি খুলে নিজের কাছে রেখে দিল। আসামী ঘরের পিছনে খেতে লাগলো, কোমরের দড়ি ধরে' দোবেজী এক টুলে ঘরে বসে খৈনী তৈরী করতে মন দিলেন। দীনদয়াল দোবেজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন, আর দোবেজী ব্রাহ্মণ, মুসলমান ছুঁয়ে কেমন ক'রে খাবেন এই ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়ে তুললেন। তাঁকে পোরী মিঠাইএর দাম নগদ ২৲ দু'টাকা দিয়ে বললেন, ডিউটি সেরে বিকাল বেলা উর্দ্দী মুরেঠা ছেড়ে, আস্নান ক'রে পবিত্র হয়ে খাবেন। নগদ দাম দোবেজীকে আরও খুশী করলো।

আসামী খাবারের ঠোঙা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোমরের দড়ি ঢিলা ক'রে পা গলিয়ে মুক্ত হ'য়ে দড়িকে ঝাঁপের সঙ্গে বেঁধে চম্পট দিল। দোবেজী দীনদয়ালের সঙ্গে তখন ধর্ম্মালোচনায় ব্যস্ত। আসামী দিলদার ততক্ষণ কতদূর চলে গেছে, খাবারের ঠোঙায় যা ছিল, তাতে তার রাত্রিতে বেশ চলবে।

দোবেজী দড়ি ধরে একটু হেঁচকা টান দিয়ে বললেন—কেত্তা ঘড়ি খায়েগারে, জলদী কর্। দড়ির সঙ্গে ঝাঁপ এসে দোবেজীর চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করলো। দীনদয়াল মুন্‌শী তখন দোকানের বাইরে ১ রশি দূরে বাগদীপাড়ার লুটে বাগদীর সঙ্গে কথা বলছেন। লুটু বাজারে বস্তা বহে। সেদিন খাটুনি না পেয়ে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরছে। সঙ্গে তার ১০।১২ বৎসরের ছেলে, বাবা কিছু পেয়েছে কিনা তাই দেখতে এসেছে মায়ের তাগাদায়। লুটুর দুখের কথা শুনে দীনদয়াল তার যাতে আজ গোটা পাঁচেক টাকা পাওনা হয় তার ব্যবস্থা করার ভরসা দিলেন।

দোবেজী ছুটে এসে দীনদয়াল বাবুর হাত ধরে কেঁদে বলে উঠলো—মোক্তার বাবু, হামারা সত্যানাশ হোগিয়া, আসামী ভাগ গিয়া, আঠাইশ বরষকা নোকরী চালা জাগা, জেহালভী হোগা, দো বরিষ বাদ পেন্‌শিল মিল্‌তা।

দীনদয়াল মোক্তার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "এ সব কাম হুসিয়ার হ'য়ে করতে হয়। কত টাকা আছে দোবেজী? শ পাঁচেক টাকা হলে বুদ্ধি করা যায়। জানেন তো শুধু হাত মুখে ঢোকে না।" দোবেজী নিজের কপালে ঘা মেরে কাতরস্বরে বললে—বাবু, মেরা পাশ ঢাই শো (আড়াই শো) রূপেয়া হ্যায়। হাম জনৌ পাকাড়কে বল্‌তে হেঁ সেবিন্ বক্সে উঠায়কে ঢাইশো (২৫০৲) আপকো পাশ এহি হপ্তাকা বীচমে হাজির করেঙ্গে। দোবেজী ছুটে গিয়ে বাসা হ'তে ২৫০৲ টাকা দীনদয়ালের হাতে দিল। দীনদয়াল বাবু দোবেজীকে গঙ্গার জল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে সে ৩।৪ দিনের মধ্যে বাকী আড়াইশো টাকা দিবে।

এইবার দীনদয়াল বাবু দিলদারের মত জোয়ান ও প্রায় এক রকম চেহারার লুটু বাগদীকে ডেকে তার হাতে ১০৲ টাকা দিয়ে বললেন—এই সিপাহীর সঙ্গে যাও সে যা বলে তাই করবে। আরও ৫০৲ টাকা এর পর দেওয়া হবে। দোবেজী মোক্তার বাবুর পরামর্শ মত চুপি চুপি হাজত ঘরের পেছন দিক দিয়ে লুটুকে হাজত ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ ক'রে রাখলো। দীনদয়াল হাজতে গিয়ে লুটুকে ভরসা দিলেন—ভয় নাই যাতে পূজোর মধ্যে ১০০৲ টাকা পাও তার উপায় করবো আমি। দোবেজীকে দীনদয়াল শুনালেন—যদি বাকি আড়াই শো না দাও তবে এই আর এক কসুর তৈরী থাকলো।

বেলা ৩টার সময় সরকারী ডাক্তার বাবু হাকিম বাবুর এজলাসে উপস্থিত হলেন। আসামী দিলদারের স্থলাভিষিক্ত লুটু বাগদীকে হাজির করা হলো। বুকে একবার ষ্টেথিস্‌কোপ লাগিয়েই ডাক্তার বাবু—আসামী বিশ ঘা বেত সহ্য করার শক্তি রাখে বলে লিখিত মত দিলেন। নির্দ্দোষ লুটু বাগদীকে যথারীতি বেতমারা ক্রশে আবদ্ধ করা হলো। বেতমারা কর্ম্মচারী বেতে চব্বি মাখিয়ে পাল্লা নিয়ে জোরে জোরে ২০ ঘা বেত মারলো। বলবান্ হলেও লুটু এই বেত্রাঘাতে কাতর হয়ে পড়লো। ডাক্তার সাময়িক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে দীনদয়াল বাবুর ব্যবস্থামত লুটুর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে ব'সে মড়া-কান্না সুরু করল—ওগো, পেটের জ্বালায় বাজারে মোট বইতে গিয়ে, এই সব জল্লাদের হাতে মারা গেলে গো। দোহাই মহারাণীর! দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের। আমি খুনের বদল খুন চাই!

হাকিম বাবুর কথায় ডাক্তার বাবু আসামীকে পরীক্ষা করে ইংরাজীতে বললেন—হি ইজ এ হিন্দু।

এইবার এই জনতার মধ্যে দীনদয়াল বাবু একখানা দরখাস্তে ও মোক্তারনামায় লুটু বাগদীর স্ত্রীর টিপ নিয়ে হাকিম বাবুর নিকট আভূমি নত হ'য়ে সেলাম দিয়ে কাগজ দুখানি তাঁর হাতে দিলেন।

দরখাস্তখানির উপর নজর পড়তেই হাকিম বাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল। প্রথম আসামী তিনি নিজে, অন্য আসামী যে লুটুকে ক্রশে বেঁধেছে, যে বেত মেরেছে। সাক্ষী ডাক্তার বাবু ও জনতার মধ্যে উপস্থিত জন পঞ্চাশ বাছা বাছা ভদ্রলোক। তিনি খাস কামরায় গিয়েই দীনদয়াল বাবুকে ডেকে পাঠালেন। দীনদয়াল বাবুকে খুব বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন—আগামী কাল অতি প্রত্যুষে তিনি (হাকিম) দীনদয়াল বাবুর বাড়ীতে স্বয়ং গিয়ে দেখা করবেন।

পরদিন সূর্য্য না উঠতে হাকিম বাবু দীনদয়াল মুন্‌শীর দ্বারস্থ হ'য়ে বৈঠকখানার কড়া নাড়া দিলেন। একটি আনন্দাসুন্দরী কুমারী দরজা খুলেই স্তম্ভিত হয়ে আগন্তুকের মুখপানে চেয়ে রইলেন। হাকিম বাবুর অবস্থাও সেই রকম। হাকিম বাবুই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন—

হাকিম—কনক!

কুমারী—নরেন দা!

কনক—আপনি এখানে?

নরেন—আমি এখানে চাকরী করি।

কনক—আই-সি-এস এর চাকরী সাব-ডিভিসানে? প্রাইমারী ইস্কুলের মাষ্টারী নাকি?

নরেন—প্রবেশনারী অবস্থায় মহকুমার চার্জ্জে থাকতে হয়। তুমি এখানে?

কনক—আমি দীনদয়াল বাবুর কন্যা। মায়ের পরলোকের পর বাবা কলকাতায় মামার বাড়ীতে আমার লেখাপড়া শেখার জন্য রেখেছিলেন। আপনি বিলাত চলে গেলেন, আমি তার পর বৎসর এম-এ দিয়ে সেকেণ্ড ক্ল্যাস হয়ে এখন থার্ড ক্ল্যাস এক নিউজ এজেন্সির লোকাল রিপোর্টার। বাবা কাল সন্ধ্যায় একটা মজার সংবাদ এনে দিয়েছেন। আমি তাকে "কমেডি অব্ এরার্স" নাম দিয়ে লিখে টাইপ করছিলাম, ডাকে পাঠাবো বলে। এমন সময় আপনি কড়া নাড়লেন।

"কমেডি অব্ এরার্স" যে কোন্ ঘটনার উপর লেখা নরেনের তা বুঝতে দেরী হলো না। তিনি বল্‌লেন—বুঝেছি, তোমার "কমেডি অব্ এরার্স" আমার পক্ষে "ট্র্যাজেডি অব্ এরার্স"।

কনক—এই হাকিম আপনি নাকি নরেনদা!

ভগবান্ তুমি আছ। আটটার ডাকে আমি এটা পোষ্ট করতাম।

এই কথা বলে ঘরে গিয়ে খান কত টাইপ করা কাগজ এনে টুক্‌রো টুক্‌রো করে নরেনের পায়ের উপর ফেলে দিল। নরেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ যন্ত্রপুত্তলির মত নিজের হাতের হীরের আংটি কনকের আঙুলে পরিয়ে দিল। কনক—করলেন কি আপনি (নরেনদা' কথাটা বলতে জিভ আটকে গেল)

নরেন—তোমার হাতের আংটি আমায় দিবে না কনক!

কনক—এটা যে তামার!

নরেন—হোক তামা। তোমার হাতে তার পাল্টা লোহা দেওয়া হবে।

কনক—একবার কথা হ'য়ে—আমি মোক্তারের মেয়ে বলে উল্টে গেছলো।

নরেন—ও কথা আর মনে করো না, কনক। আজ আমি সেই মোক্তারের দ্বারস্থ। যাঁদের প্রেষ্টিজ তাঁদের সঙ্গে গেছে। আজ আমি মা-বাপহারা ভাগ্যহীন স্বাধীন। আর উল্টাবার কোনও ভয় নাই। "নরেন" উল্টালেও "নরেন"। "কনক" উল্টালেও "কনক"।

কনক—তামার আংটির বদলে হীরা, অদৃষ্টে বুঝি বিধাতা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লিখেছিলেন। 'নিন্' বলে তামার আংটি নরেনের হাতে পরিয়ে দিল।

কনক যখন আংটি নরেনের আঙুলে দিচ্ছে, এমন সময় দীনদয়াল বাবু উপস্থিত হলেন। কনক লজ্জিত হয়ে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল। নরেন দীনদয়াল মোক্তারের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন কালকের দরখাস্তখানা এনেছি। দীনদয়াল বাবু সেখানা ছিঁড়ে ফেলে, নরেনের হাতে কনকের হাত মিলিয়ে দিয়ে সজলনেত্রে বল্লেন—আজ দীনদয়ালের ধাপ্পাবাজীর যবনিকা পতন! দিলদারের বাপ খোসবর তার ছেলের বেত খাওয়া বাঁচিয়ে দেওয়ার বখশিশ ১০০৲ টাকা দীনদয়াল বাবুকে দিতে এসেছে। লুটু বাগদীর স্ত্রী তার দরখাস্তের কি হবে জানতে এসেছে। খোসবরের দেওয়া ১০০৲ একশো টাকা লুটুর স্ত্রীর হাতে দিয়ে বল্লে বাগদী-বৌ হাকিমের হাতে নাগাইদ '২৫শে অঘ্রাণ হাতকড়ি পরাব। (২৫শে অগ্রহায়ণ আনুষ্ঠানিক বিবাহের দিন)

শারদীয় মহাপূজায় প্রীতি-সম্ভাষণ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

মুখোশ

—শতদল গোস্বামী

'দৈনিক রামরাজ্য' পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখছে অবিনাশ। প্রায় রোজই তাকে লিখতে হয়, বিশেষ করে সহযোগী 'দৈনিক কলিযুগ' পত্রিকার বিরুদ্ধে যখন বিষোদ্গার করবার প্রয়োজন হয় তখন অবিনাশ ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে লেখাতে ভরসা পান না প্রধান সম্পাদক শ্রীরামসদয় সামন্ত মশায়। অদ্ভুত ভাষার জোর অবিনাশের এবং এত চমৎকার গুছিয়ে লিখতে পারে সে যার জন্যে রামসদয়বাবু তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ। সত্যি কথা বলতে কি অবিনাশের জন্যেই আজ 'রামরাজ্য' পত্রিকা দাঁড়িয়ে গেছে। রামসদয়বাবু অকৃতজ্ঞ নন, তিনি প্রতিভার মূল্য দিতে জানেন। তাই বেশ মোটা দক্ষিণায় অবিনাশকে এই পত্রিকায় আটকে রেখেছেন। তিনি জানেন, 'কলিযুগ'কে ঘায়েল করতে পারে একমাত্র অবিনাশের শক্তিশালী লেখনী। তাকে হাতছাড়া করা মানেই পত্রিকার অকাল মৃত্যু ঘটানো। অতএব, অবিনাশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে রামসদয়বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়।

রামরাজ্য এবং কলিযুগ এর রেষারেষি আজকের নয়, বহুদিনের। উভয় পত্রিকার নীতির আকাশ পাতাল প্রভেদ। রামরাজ্য যদি ডাইনে হেলে, কলিযুগ চলে বাঁয়ে। প্রথমটি দক্ষিণপন্থী, দ্বিতীয়টি বাম। রামরাজ্য সর্বাঙ্গে সরকারী বিজ্ঞাপন জড়িয়ে ভারতরাষ্ট্রের মহিমা কীর্তন করে, কলিযুগ-এর ভাগ্যে সরকারী বিজ্ঞাপন না জুটলেও বে-সরকারী বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করেই যে সে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে, সে ইতিহাস সর্বজনবিদিত। সরকারের দোষ ত্রুটী যেমন রামরাজ্য-র চোখ এড়িয়ে যায়, বাস্তহারাদের সম্পর্কে সরকারের বিরাট পরিকল্পনা যে বিরাট ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়, তার ইঙ্গিত দেয় কলিযুগ।

সরকারের পক্ষে এবং বিপক্ষে ঢাক পিটাতে পিটাতে উভয় পত্রিকার মধ্যে মাঝে মাঝে তীব্র লড়াই বেধে যায়। সেটা স্বাভাবিক। নিরপেক্ষ পাঠকদের পক্ষে সেই মসীযুদ্ধ পরম উপাদেয় হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু পত্রিকার যাঁরা গোঁড়া ভক্ত এবং অন্ধ সমর্থক তাদের মাথা ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং, উভয় পত্রিকার অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি হয় এবং প্রায়ই হয়। এবং সেটাও স্বাভাবিক। কারণ, পত্রিকার নীতি প্রচার করতে হলে মাঝে মাঝে মাথা ফাটাফাটি হওয়া ভাল। সেটা পত্রিকার পক্ষে শুভ।

অতএব, চিরাচরিত প্রথায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে চলেছে অবিনাশ। যার নুন খায় তার গুণ গাইতে মোটেই কার্পণ্য করবে না সে। কাজেই, মালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে কলিযুগ-এর বিরুদ্ধে কলমের মুখে গালাগালির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল অবিনাশ।

(২)

পরদিন। কলিযুগ পত্রিকার অফিস। প্রধান সম্পাদক মিঃ অধিকারী চুরুট মুখে উন্মত্তের মতো পায়চারী করছেন। আজকের রামরাজ্য তাঁকে চরম অপমান করেছে। তিনি মনে মনে রামরাজ্য সম্পাদকের মুণ্ডুপাত করতে লাগলেন এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন…… শালাকে দেখে নেব। হঠাৎ তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন…… মিত্তির, এই মিত্তির ……

—বলুন সার? পাশের ঘর থেকে পড়ি মরি করে ছুটে এলেন সহযোগী সম্পাদক।

ঃ রামরাজ্য-র সম্পাদকীয় পড়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সার, পড়েছি।

ঃ পড়েছ, অথচ চুপ করে আছ? না, তুমি ডোবাবে দেখছি। রামরাজ্যর বিরুদ্ধে আজ সম্পাদকীয় লিখে ঐ শালা রামসদয়ের মুখোশ খুলে দাও। আমাদের দলকে বলে কিনা দেশদ্রোহী সুবিধাবাদীর দল! এর যোগ্য উত্তর দেওয়া চাই কিন্তু মিত্তির। দেখব তোমার কলমের কেরামতি। মুখে রামধুন সঙ্গীত আর মাথায় খদ্দরের টুপি পরলে কংগ্রেস-ভক্ত হওয়া যায় কিন্তু দেশ সেবার অন্যগুণ থাকা চাই,—সে হচ্ছে স্বার্থত্যাগ। ও শালা চামচিকে দেশের জন্যে কি ত্যাগ করেছে, শুনি? কি আমার স্বদেশ ভক্তরে! মুখ খুলে চুটিয়ে গালাগাল দাও শালাকে। দেশের লোকে জানুক রামসদয় শালা কতবড় প্রতারক, কতবড় ভণ্ড, কতবড় ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার। বুঝেছ?

—বুঝেছি সার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এক্ষুনি প্রবন্ধ লিখে এনে আপনাকে দেখাচ্ছি। প্রধান সম্পাদকের ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন সহযোগী সম্পাদক।

মিঃ অধিকারী নিশ্চিন্তই আছেন। মিত্তিরের উপর তাঁর অগাধ ভরসা। ওর কলমের জোর আছে সেটা স্বীকার করতেই হবে। রামরাজ্যকে জব্দ করতে পারে একমাত্র ও-ই। কি ভাষার তেজ! যেন আগুনের ফুলকি! দীর্ঘজীবী হোক মিত্তির, অক্ষয় হোক ওর সাহিত্য-সাধনা। মনে মনে তিনি আশীর্বাদ করেন মিত্তিরকে।

অতএব, চিরাচরিত প্রথায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে চলেছে মিত্তির। যার নুন খায়, তার গুণ গাইতে মোটেই কার্পণ্য করবে না সে। কাজেই মালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে রামরাজ্যর বিরুদ্ধে কলমের মুখে গালাগালির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল মিত্তির।

(৩)

জ্যোৎস্না রাত। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মিত্তির মেসের পথে পা বাড়াল। সে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত, তার এখন বিশ্রাম চাই, পরিপূর্ণ ঘুম। দিনের পর রাত খবরের কাগজ অফিসে একঘেয়ে কাজ করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সে আজ রামরাজ্য সম্পাদকের মুখোশ খুলে দিয়ে এসেছে। কাল তাকে আবার হয়ত কলিযুগ সম্পাদকের মুখোশ খুলতে হবে। কিন্তু তার মুখোশ যদি একবার খুলে পড়ে? যে অবিনাশ দিনের বেলায় রামরাজ্যর সম্পাদকীয় লিখে, সেই আবার রাতে মিত্র সেজে কলিযুগ-এর আসর গরম করে।

হায়, অবিনাশ এবং মিত্র যে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, দিনের পর রাত সে যে একই ধরণের অভিনয় করে যাচ্ছে, সে খবর কি কেউ জানে? না, কেউ জানে না।

———

শারদীয় উৎসবে সকলের আন্তরিক
প্রীতি ও শুভকামনা করি

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোর

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল ও রিক্সা স্পেয়ার পার্টস ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্ন সহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

বিদেশ যাত্রীর ডাইরীর কয়েক পাতা

—শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী

অভাবনীয়রূপে পেয়ে গেলাম ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত কমনওয়েলথ স্কলারশিপ ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে। সেই অনুযায়ী স্থির হল যে ১৯৬৬-৬৭ সালে ইংলণ্ডের এক্সিটর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পড়াশোনা করতে হবে। মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার শৈশবের স্বপ্ন যখন বাস্তবে পরিণত হতে চল্‌ল তখন আনন্দের থেকেও উত্তেজনা হ'ল প্রবল। যাইহক, বিদেশ যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, বোম্বে থেকে বিশ্বের বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজ "মার্কণীতে" যাত্রা সুরু করলাম। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়লো। আমি তখন জাহাজে ডেকে দাঁড়িয়ে, বোম্বের নিকটস্থ সমুদ্রবক্ষে চারিদিকে বহু ছোট-বড় পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তারই মাঝ দিয়ে আমাদের জাহাজ এগিয়ে চল্‌ল। ধীরে ধীরে চোখের সামনে থেকে আমাদের দেশের শেষ তটরেখা অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। উত্তাল ফেনিল সমুদ্রের ওপর ভেসে চল্‌ল 'মার্কণী,' সঙ্গে চলেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী যাত্রী ও নাবিক সহ প্রায় দু'হাজার জন।

আমাদের জাহাজটিও ছিল ছোটখাট একটি শহরের মত। সিনেমা, ডাকঘর, কাফে, খেলার প্রাঙ্গণ ও সুইমিং পুল কিছুরই অভাব ছিল না। এই জাহাজেই সুরু হ'ল আমার বিদেশে থাকার শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব। পরিচিত হতে লাগলাম বিভিন্ন ভাষাভাষীর সঙ্গে ও ইউরোপীয় আচার ব্যবহার ও আদব কায়দার সঙ্গে। জাহাজের সবাই যেন একই বিশ্ব-মানব পরিবারের সদস্য। মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা পেলো মুক্তি।

পাঁচদিন পরে এডেনে পৌছে আবার তটরেখার দেখা পেলাম। দু'দিন পরে লোহিত সাগর পার পৌছালাম এসে সুয়েজ খালের মুখে, সুয়েজ বন্দরে। সেখানে জাহাজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে জাহাজের ইচ্ছুক যাত্রীদের মিশরের রাজধানী কাইরো যাওয়া ব্যবস্থা হ'ল ৬ পাউণ্ডের বিনিময়ে। ভারতীয়দের মধ্যে আমি ও আর একজন মাত্র সে সুযোগ গ্রহণ করলাম। অপূর্ব সুন্দর শহর এই কাইরো। গোটা শহরটি যেন ছায়ায় ঘেরা ছোট ছোট কুঞ্জের মাঝে সাজানো রয়েছে। শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে নীলনদ এঁকে বেঁকে।

কাইরোর একটি কাফেতে প্রাতরাশ সেরে সাহারার বুকে বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও স্ফিংক্স দেখতে গেলাম। দুই পাশে ধু ধু করা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চল্‌ল আমাদের বাসগুলি। প্রাচীনকালে মিশরের রাজাদের মৃতদেহ মমি করে রাখা হত পিরামিডের গোপনতম কক্ষে। খুব অন্ধকার পথ বেয়ে মাথা নীচু করে উঠে গেলাম পিরামিডের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে। সে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা। নীলনয়নাদের সঙ্গে শাড়ী পরে অপটু বাঙ্গালী পদক্ষেপে উঠতে খুবই কষ্ট হয়েছিল স্বীকার করতে বাধা নেই। কাইরো শহরের সবকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলাম পোর্ট সৈয়দে—যেখানে ইতিমধ্যেই আমাদের জাহাজ এগিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আবার জাহাজ ছাড়লো।

ক্রমে ভূমধ্যসাগরের মধ্যে দিয়ে আমাদের জলযানটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো ইউরোপের এক একটি বন্দর। নেপেলস্ থেকে দেখতে পেলাম সেই ভয়াবহ 'ভিসুভিয়াস্'। এরই একটু দূরে জাহাজ থেকে নেমে দেখতে গেলাম পুরাতন পম্পাই শহরের ধ্বংসাবশেষ।

অবশেষে দীর্ঘ তেরো দিন পরে ইটালীর জেনেয়া বন্দরে এসে আমাদের জলযাত্রা পর্ব শেষ হল। সেখানে কাষ্টমসের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ইনটারন্যাশানল এক্সপ্রেস যোগে রওনা হলাম ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরের উদ্দেশ্যে। পথে পড়ল Mont Cenis এর বিখ্যাত Tunnel। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে টানেলটি পার হতে লাগল গাড়িটির আধ ঘণ্টা। ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেণে করে পরদিন সকালে পৌছালাম ক্যালে বন্দরে। সেখানে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে পৌছালাম ইংলণ্ডের ফোকষ্টোন বন্দরে। সেখান থেকে আবার ট্রেণে করে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছালাম সন্ধ্যা নাগাদ।

আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের দুইজন প্রতিনিধি। Queen's garden নামে লণ্ডনের একটি হোস্টেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। সমস্ত হোষ্টেলটি ছিল centrally heated কাজেই শীতের প্রকোপ তখনও কিছু বুঝিনি। পরদিন আমাকে কিছু অর্থ, ম্যাপ ও প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিয়ে বলা হল পাঁচদিন পরে ডেভনশায়ারের এক্সিটরে যেতে হবে। আমি প্রথমে সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়লাম। তাই তো, এই বিরাট লণ্ডন শহরে আমি একেবারে একা, কিছুই জানি না, কাউকেই চিনি না। ওই হোস্টেলে একজনও ভারতীয় ছিলেন না। কি করে এই পাঁচদিনে সারা লণ্ডন শহরটি ঘুরে দেখা সম্ভব হবে চিন্তা করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু কি জানি কেমন করে দেখলাম আমি দিব্যি ম্যাপের সাহায্যে ওই পাঁচদিনে দেখে ফেল্লাম লণ্ডন শহরের সব কটি দ্রষ্টব্য স্থান। ভূগর্ভস্থ রেলপথই লণ্ডনে যাতায়াত করার সবচেয়ে সস্তা ও সহজ উপায়। টেমস্ নদীর তলা দিয়ে গিয়ে এই ভূগর্ভস্থ রেলপথ পূর্ব্ব ও পশ্চিম লণ্ডনকে যোগ করেছে। আশ্চর্য্য হয়ে গেছি যখন দেখেছি লণ্ডনে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজের তাগিদে অতি দ্রুতগতিতে উঠানামা ও যাতায়াত করছে অথচ যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই, কোথাও কোন ঠেলাঠেলি নেই। যন্ত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় মূল্য ফেলে দিয়ে মিনিটের মধ্যে টিকিট বের করে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই নিজের নিজের গাড়ি ধরতে কি বিরাট কর্ম্ম চাঞ্চল্য অথচ কোন হৈ চৈ নেই আমাদের দেশের মত। তাই বুঝি এরা নিঃশব্দে বড় বড় কাজ করতে পারে।

পথে ঘাটে সর্বত্রই পেয়েছি ইংরেজ পথচারীদের অকুণ্ঠ সাহায্য। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে ভারতীয় দেখে যখন ছুটে গেছি কোন কিছু জানার জন্য তাঁরা আড়চোখে ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করেছেন মাত্র, আমি নবাগতা কিনা। তারপর তাঁরা নিজের পথ ধরেছেন।

ব্রিটনে থাকাকালীন ও দেশের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাকাহিনী ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছা রইলো।

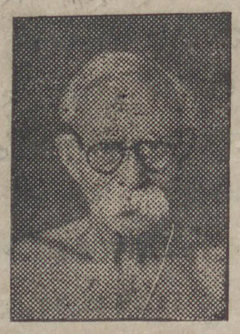

দাদাঠাকুরের 'পানিং'

—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

কথার যাদুকর ছিলেন দাদাঠাকুর। স্বতঃস্ফূর্ত ফোয়ারার মতো তাঁর মুখ থেকে বেরোতো রসে ভরা কথার পর কথা। এই সব কথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 'পানিং'। মানুষের নাম নিয়ে 'পানিং,' ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে 'পানিং,' স্থান বিশেষের নাম নিয়ে 'পানিং,'—যেখানে যে প্রসঙ্গ এসেছে, অপরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি তার মধ্যে 'পানিং'-এর রসসঞ্চার করেছেন। এ-রকম শত শত 'পানিং' আছে দাদাঠাকুরের। গুটিকতক নমুনা দিই :

সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ি ময়মনসিং। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে গান সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল একদিন। দাদাঠাকুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুরেশচন্দ্র ছিলেন দাদাঠাকুরের প্রিয়পাত্র। দাদাঠাকুর সুরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের জেলার সব লোকই কি গাইতে পারে?'

'সারা দেশশুদ্ধ লোকই কি আর গাইতে পারে? এ কি সম্ভব?'

দাদাঠাকুর বললেন—'তবে তোমাদের জেলার নাম My-men-sing হ'লো কেন?'

*

কলকাতায় দাদাঠাকুর কিছুকাল ছিলেন কলুটোলায় তখনকার কালের বিখ্যাত কর্পোরেশন কাউন্সিলার সত্যব্রত সেনের বাড়িতে। সত্যব্রত সেনের ডাকনাম ছিল গদাই। 'কলকাতায় কোথায় আছেন দাদাঠাকুর?'—কেউ জিজ্ঞাসা করলে দাদাঠাকুর উত্তর দিতেন—'আমার ভাগ্যে এখন গদার বাড়ি।'

*

একবার বাংলাদেশে ভালো ফসল হ'লো না—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সে-সময়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় দাদাঠাকুরকে মুর্শিদাবাদে ধানের অবস্থা কেমন, জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন—'যে-দেশের মুখ্যমন্ত্রী বি-ধান, সে-দেশে কখনো ধান ফলে?'

*

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে বেশ প্রীতির সম্পর্ক ছিল দাদাঠাকুরের। শিশিরকুমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন দাদাঠাকুরকে। শিশিরকুমার মদ্যপান করতেন, এ কথা তখন সর্বজনবিদিত ছিল। দাদাঠাকুরও জানতেন। একদিন অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্যে শিশিরকুমার তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে অভিনয় করতে পারলেন না। দাদাঠাকুর শুনে বললেন—'পারবে কোত্থেকে? ওতো সেদিন শিশি-র ভাদুড়ী ছিল না,—সেদিন ও বোতলের ভাদুড়ী।'

*

কেবল বাংলা ভাষাতেই নয়, ঠিক তাল বুঝে বাংলা শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দ জুড়ে দাদাঠাকুর 'পানিং'-এর রস পরিবেশন করতেন। বহরমপুর শহরে সে-বার মিউনিসিপাল ইলেক্‌শন। নির্বাচনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—রমণীমোহন সেন ও নীলমণি ভট্টাচার্য। দাদাঠাকুর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—'রমণীই জিতবে, নীলমণি হারবে।' শেষ পর্যন্ত হ'লোও তাই। রমণীর কাছে নীলমণি হেরে গেলেন। কেমন ক'রে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, জিজ্ঞাসা করায়, দাদাঠাকুর বললেন—'সবই টাকার খেলা ভাই। Raw-money-র সঙ্গে nil-money পারবে কেন?

*

দাদাঠাকুরের একটি বিখ্যাত গান আছে—'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব' কীর্তন গানের প্যারডি। সেই গানে একটি জায়গায় আছে—

স্বর্গে যেতে চাই না আমি
কালারে তেয়াগি,
আমায় মর্গে যেন নিয়ে না যায়
পোষ্টমর্টেম লাগি।

মর্গে নিয়ে না যাবার কারণ দেখিয়ে দাদাঠাকুর এখানে আখর জুড়েছেন—

ননদীর অভিশাপ তবে ফলে যে যাবে—
সে সদাই ব'লতো মর্‌গে যা
অভিশাপ তবে ফলে যে যাবে।

সখিদের কাছে শ্রীরাধার অনুরোধ—

মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে।

কারণ, তাঁর শ্যামসুন্দর যেমন কালো, তমাল-ডালও তেমনি কালো। এখানে দাদাঠাকুর আখর দিয়েছেন। সখিরা বলছেন—

কালার colour similar ব'লে
এ গাছে রেখেছি,
শ্যাম colour-এর same colour
এ গাছে রেখেছি।

এই কীর্তন গানটির প্যারডি করার অপরাধের জন্যে দাদাঠাকুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলছেন—

যেন পায়ে রেখো
এই উপায়বিহীন culprit-এ দু'পায়ে রেখো
সদুপায়ে দু'পাই পাই যেন
দু'পায়ে রেখো।

'ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ম্ময়'—

(আগমনী)

—সরোজকুমার ঘোষ

"নম্র হল শিকলে-বাঁধা দানব,
তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা—
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে।"

এই উদ্ধৃতিটা বারবারই মনে পড়ে, যখনই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সংবাদপত্রের শিরোনামাতে। তাই তো! দেশের আজ অঞ্চল থেকে অঞ্চলান্তরে কী বিশৃঙ্খলতা। সত্যই কী আদিম বর্বর বেরিয়ে এসেছে আমাদের স্বভাবের কালো গর্ত থেকে? প্রশ্নটা বিরাট। কিন্তু একটি মাত্র 'হ্যাঁ' বললেই চিন্তার কিছুই থাকে না। এতো জননী ধরিত্রীর নাভিতে লেগে থাকা পাগলামি। আর, সেটা আমরা লাভ করেছি উত্তরাধিকার সূত্রে। এইতো সহজ সমাধান। আর কি আছে চিন্তার? তবুও চিন্তায় পড়ে না ছেদ। বারবার মনে আসে অধুনা অতি প্রচলিত কয়েকটি শব্দ যথা—যুগযন্ত্রণা, অবক্ষয় ইত্যাদি। কেন এই যুগযন্ত্রণা? কিসের এই অবক্ষয়? এই যুগযন্ত্রণা কি বিদ্রোহী কবি-কথিত 'যুগ সঞ্চিত পুঞ্জিত ব্যথার অভিযান'? কিন্তু অবক্ষয়?—সেকি দীর্ঘদিনের প্রচলিত আদর্শবাদের মহাউৎপীড়নের অবসান বা জীর্ণ আবেশের পরিসমাপ্তি!—না, বিজ্ঞানের জয়-যাত্রাতেই এর সূচনা। মানুষের গ্রহ থেকে উপগ্রহে গমন, ডাঃ খোরানার কৃত্রিম জীবকোষ সৃষ্টির প্রথম পর্বের সকল পরিসমাপ্তির ন্যায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সার্থক প্রচেষ্টাতেই কী আজ দীর্ঘদিনের জড়বাদ ও ঐশীবাদের দ্বন্দ্বে জড়বাদের জয়যাত্রার 'অয়মস্তু শুভারম্ভ'। এখন নিঃসংশয়তিভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, সকল রকম জৈব পদার্থের মূলাধারই 'মেটিরিয়াল'। এই সব লব্ধ জ্ঞানের মানদণ্ডে আজ প্রচলিত ঐশীবাদ ও ভাববাদের পুনর্মূল্যায়ণ অপরিহার্য। সেজন্য এই অবক্ষয়, সত্যকারের ক্ষয় নয়—নবীনতর সৃষ্টির পূর্বাভাস মাত্র। যেমন 'মৃত্যুর মুখেই ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়-যাত্রা'। এই কারণে, আজও পশ্চিমবঙ্গের এই প্লাবনের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করা যায় তথাকথিত অবক্ষয়িত ও যুগযন্ত্রণা-মথিতের মধ্যে 'অমৃতস্য পুত্রা'র!

প্রত্যাবর্তন ঘটুক প্রথম প্রশ্নে। আজকের যে বিশৃঙ্খলতা রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদ্‌দের বহু আয়াসলব্ধ সুখভোগের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করে তাদের সুখ-তন্দ্রার অবসান ঘটিয়েছে, তার মূল কোথায়? এই মূল প্রবঞ্চনা তথা আত্মপ্রবঞ্চনাতে। বঞ্চিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদ্ নির্যাতিত উৎপীড়িত ও বঞ্চিত জনগণের বঞ্চনার ও বেদনার তথাকথিত অংশীদার হয়ে যখন কৃপা-মহান নেতৃত্ব প্রদান করেন তখনই সুরু হয় এই আত্মপ্রবঞ্চনা। কবির ভাষায় "ভাল নয়, ভাল নয় সৌখিন সে মজদুরী।" সত্যই এটা সৌখিনতা মাত্র। কারণ, এই বঞ্চিত-মধ্যবিত্ত-নেতৃত্বের ককলস সদৃশ রূপান্তর ঘটে আত্ম-সিদ্ধিলাভে। সে নেতৃত্ব তখন বিস্মৃত হয় বঞ্চিতের বঞ্চনার ও উৎপীড়িতের উৎপীড়নের কথা। তার মনের অবচেতন স্তরে ধ্বনিত হোতে থাকে, 'হেথা নয়, হেথা নয়; আর কোথা, অন্য কোন খানে।' সেই বঞ্চিতের বঞ্চনার ও উৎপীড়িতের উৎপীড়নের ব্যথায় একদা-বিগলিত নেতৃবর্গের মুখে শব্দিত হোতে থাকে 'জন-বিস্ফোরণের' সূত্র ও তার ফলশ্রুতি স্বরূপ জনগণের অর্থ নৈতিক দুর্দশার কথা। একদা যিনি ছিলেন ধনবণ্টন বৈষম্যের জন্য সৃষ্ট উৎপীড়নের কথায় পঞ্চমুখ, তিনি উক্ত বৈষম্যমূলক ধনবণ্টনের মধ্যেও স্বকীয় তথা-কথিত 'ভাগ' আহরণে সমর্থ হয়ে, হন শান্ত সমাহিত। তাই আবার প্রশ্ন জাগে, এই বণ্টন-বৈষম্যজনিত দুরারোগ্য ক্ষতের অস্ত্রোপচারে যাঁরা আজ কৃত-সংকল্প, তাঁরাও কি শেষে প্রোক্ত পূর্ব-সূরীদের পন্থা অবলম্বন করবেন?—না, সুষম ধনবণ্টনের ব্যবস্থা করে এই বিশৃঙ্খলতার ছেদ টানবেন? ইতিহাসে গতিভঙ্গীতে এই মহা প্রত্যাশা পূরণের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে মনে। কারণ, গণ নারায়ণের স্কন্ধে আরোহণ করে মহাসুখে ও মহা-উল্লাসে যে 'গণেশে'র আবির্ভাব হয় আমাদের বিধান-সভায় ও মহাকরণের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, তার ভাবমূর্ত্তি হয় অচিরেই মসীকলঙ্কিত! সেখানেও, পরিশেষে ভাবমূর্ত্তি ভেদ করে নম্র-হওয়া শিকলে বাঁধা দানব বেরিয়ে আসে তার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে, বিসর্পিল পথে স্বকীয় আদিম বর্বরতায়। উল্টে যায় জন-'গণেশ'! আমরা—উপাসকরা—হই বিভ্রান্ত ও বেদনা-বিমূঢ় আমাদের বহু যত্ন সৃজিত ও উপাসিত এই গণ-দেবতার আদিম নগ্নতায়। সেজন্য, যতদিন না এই উৎপীড়িতের, বঞ্চিতের, লুণ্ঠিতের ও সর্বহারাদের মধ্য থেকে সত্যকার 'গণেশে'র আবির্ভাব না হচ্ছে, ততদিনই পুনরাবৃত্তি ঘটবে এই বিশৃঙ্খলতার।

আর, গতিই যখন জীবন, পরিবর্তন-ই যখন দেবতা; তখন জ্ঞানরাজ্যে—'এই শেষ, আর নেই'—একথা অবাস্তব ও অবান্তর। তাই নব-নব জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অথবা নবীন থেকে নবীনতর বৈজ্ঞানিক তথ্যের উদ্ঘাটনের ফলেই প্রচলিত বিশ্বাস ও ভাববাদের রূপান্তর ঘটবে সর্বকালেই। সেই রূপান্তরই যুগ-যুগান্ত ধরে অভিহিত হবে অবক্ষয় নামে।

পুনরুক্তির ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে পরিসমাপ্তির রেখা টানবার পূর্বে, আজ দানব-দলনীর আগমনের এই শুভ লহমায় সাদর 'আবাহন' জানাই আমাদের সর্বহারা, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত চাষী মজদুর ভাইদের মধ্য থেকে উদ্ভূত অনাগত নবীনতর নেতৃত্বকে—তথা সত্যকারের জন-গণেশকে। অবসান হোক মরীচিকা সদৃশ মেরু-জ্যোতিরূপ এই নেতৃত্বের; আর অভ্যুদয় হোক তিমিরবিদার জ্যোতির্ময়ের। আরও বলি, জয়তু বিশৃঙ্খলতা—তোমার মৃত্যুতেই সূচিত হয় শৃঙ্খলতার জন্ম এবং তথা-কথিত শৃঙ্খলতার অবসানে, হয় তোমার উদ্ভব। এই চক্রাবর্তনেই জীবন ও মৃত্যু—সৃষ্টি ও ধ্বংস, তথা প্রগতি ও প্রলয়। সত্য স্বীকারের মানসিকতায় আজ যেন আরও বলতে পারি, 'Old order changeth, yielding place to the new'। আর বিশ্বকবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যেন গাইতে পারি সেই চিরন্তন আগমনী,—'ভেঙেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়— তোমারি হউক জয়।'

আমার দুর্গোৎসব

— অবনীকুমার রায়

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আমার দুর্গোৎসব প্রবন্ধে দুর্গতিনাশিনী, দশপ্রহরণ-ধারিণী, শক্তিস্বরূপিণী, মৃন্ময়ী দুর্গাদেবীকে দেশমাতৃকারূপে প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন, "আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি।" তিনি সেই মৃন্ময়ীমূর্ত্তির মধ্যে সেই দেশমাতৃকাকেই খুঁজেছেন এবং পেয়েছেন। চিনেছেন তিনি তাঁর সেই ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেশ-মাতৃকাকে। "চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ীমৃত্তিকা-রূপিণী" বঙ্গভূমি। আজ আমরা সেই দেশমাতৃকাকে বিস্মৃত হ'য়ে ঢাক-ঢোল সানাই মাইক বাজিয়ে দুর্গাপূজা ক'রছি। টাকার ছিনিমিনি খেলা, ঐশ্বর্যের দম্ভ দেখাবার জন্য কত রকমের ব্যবস্থা, কত খরচ। পূজার খরচ নাম মাত্র অথচ অকৃপণ হস্তে জাঁকজমক ক'রে আমরা আত্মপ্রচারে ব্যস্ত, কার পূজা কত বড়।

দেবী আরাধনায় ভক্তি কোথায়? মায়ের সন্তানের প্রতি ভালবাসা কোথায়? প্রতিমার অদূরে দাঁড়িয়ে ঐ যে ভিখারিণী মেয়েটি 'শূন্য-দৃষ্টিতে' মার দিকে চেয়ে আছে, একটুখানি প্রসাদ পাবার জন্য কাতর নিবেদন জানাচ্ছে, কই তার দিকে তো আমরা একবারও চেয়ে দেখ্‌ছি না। তাই কবির কথাই বলি, 'মিছে এই সহকার শাখা, মিছে এই মঙ্গল কলস।'

আজ ক্ষুধাকাতর বঙ্গভূমির এই মহাপূজায় আমরা কি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা'কে দেখ্‌তে পাই? ব'ল্‌তে কি পারি,—হে বঙ্গজননি, তুমিই "দিগভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্টবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মীভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

পারিনা। যেখানে সন্তান ক্ষুধায় কাতর, দুর্বলকণ্ঠে শুধু আওয়ায়,—'রূপংদেহি, ধনংদেহি, যশদেহি, দ্বিষোজহি,' সেখানে কি সত্যই মায়ের পূজা হ'তে পারে; সেখানে কি কোন ধর্মাচরণ সম্ভব? তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে ভারতের তথা বাংলার বীভৎস রূপ দেখে তারস্বরে ঘোষণা ক'রেছেন, "Give bread to the starving millions and then religion."

মা, আমাদের খাদ্য দাও, বস্ত্র দাও, শিক্ষা দাও, মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমরা যেন মানবরূপী ঈশ্বরের পূজা ক'রতে পারি; যেন ব'ল্‌তে পারি, "নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, আমার রক্ত, আমার ভাই'।

কই সেই বঙ্গদেশ, যার ললাটে গৌরবতিলক পরিয়ে দিয়ে একদিন মহামতি গোখ্‌লে ব'লেছিলেন, "What Bengal thinks to-day, the whole of India will think tomorrow."

আজ বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পরাজিত, সর্বহারা। তার প্রহরণ ধূলি-লুণ্ঠিত; শত্রুমর্দনের কোন শক্তিই আজ তার নাই। দেশ আজ লক্ষ্মী-ছাড়া; 'বিদ্যাবিজ্ঞান' আজ দেশ ছেড়ে পশ্চিমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। পশ্চিমে না গেলে আজ আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না।

সেইজন্যই তো মহামায়ার আরাধনায় আজ বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠেই আমাদের ব'ল্‌তে হয়, "শক্তি দাও সন্তানে,..... এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব।" কিন্তু কাঁদিব না।

খণ্ডিত বাংলার অশেষ দুর্গতি নিয়ে আমরা অনেক কেঁদেছি। দেখেছি,—কাঁন্নায় হয় তো মুষ্টিভিক্ষালাভ করা যায়; কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অতএব আমরা শক্তি চাই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীতে।

খণ্ডিত বাংলার যে কয় কোটি সন্তান আমরা আজো আছি, এসো আজ আমরা সবাই এক সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করি, "এবার আমরা সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি। এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব .....উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!'

আমরা কি আজ এই মহাদুর্যোগের দিনে এ প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে পারবো না। আমরা কি সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে, 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' মার পূজা ক'র্‌তে পারবো না? আমরা কি সমস্বরে ব'ল্‌তে পারবো না,—'উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি'।

যদি না পারি ধ্বংস আমাদের অনিবার্য।

আর তা যদি পারি, তবে—"কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লুচিমণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মার চরণে প্রণাম দিবে—কত দীনদুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়ক মঙ্গল গাহিবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! ম.!"

অতএব এসো আমরা, আজকার দিশেহারা বঙ্গ সন্তানেরা, দেশ-মাতৃকার চরণ ছুঁয়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে বলি,—

নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোঽস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে॥

প্রার্থনা করি,—

ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোঽস্তু বিমোচিতঃ॥

যুগে যুগে তুমি তো মা! অসুরদর্প দলন করিয়াছ। আজ সমাজের স্তরে স্তরে অসংখ্য অসুরের অত্যাচারে তোমার চরণাশ্রিত কোটি কোটি নরনারীর অন্তরের বেদনা হে অন্তর্যামিনী দেবি! তুমি তো সবই বুঝিতেছ। সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির আসুরিকশক্তি চূর্ণ করিতে হে মহিষাসুরমর্দ্দিনী মা তুমি আবির্ভূতা হও।

—দাদাঠাকুর

জীবনশিল্পী দাদাঠাকুর

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

আজ থেকে দুই বৎসর আগে দাদাঠাকুরের দেহ মর্ত্যলোক ত্যাগ করেছে। তিনি আর ইহলোকে নাই কিন্তু রূপরসজ্ঞ প্রতিভাবান কথার জাদুকর সকলের মনে অক্ষয় অমরতার বিজয়কেতন উড়িয়ে প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করছেন। এই কথার জাদুকরকে মৃত্যুর কিছুদিন আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"তাঁর বয়স কত হ'ল ?" হাসতে হাসতে তিনি বলে উঠলেন 'এইট্টি-সেভেন্ আইদার ইন হেল্ অর ইন্ হেভেন'।

তিনি ছিলেন জীবনশিল্পী। শিল্প প্রতিভা ছিল বহু বিচিত্র। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ফলে জীবনকে পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে এক কথায় তিনি জীবনের এক অভিনব রূপকার। দারিদ্র্যকে তিনি কোন দিনই ভীতির চোখে দেখেন নি। রসিকতার ছলে বলতেন 'man of property is a man of poverty.' এই থেকে তাঁর মনের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

কাব্যে, সাহিত্যে, হাস্যরসে এমন কি নাট্যশিল্পে তাঁর অবদানও কম নয়। এই জীবনশিল্পী অভিনয়কে কত ভালবাসতেন তার একটা উদাহরণ দিবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। অনেক দিন আগের কথা, তখন আমরা ছোট। সেই সময় দাদাঠাকুরদের "সরলা" অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। অভিনয়ের মাঝখানে খবর এলো দাদাঠাকুরের ছেলের কলেরা হয়েছে। স্বর্গত ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের একটি ছোট ভূমিকা ছিল। দাদাঠাকুর ডাক্তার বাবুকে বল্লেন—"পূর্ণ তুই গিয়ে যা হয় কর, আমি ত ডাক্তার নই। তোর ভূমিকাটা আমি করে দেবো।" রাত্রি ৩ টার পর অভিনয় শেষে তিনি বাড়ী গেলেন। এতেই তাঁর অটুট মনবলের পরিচয় প্রকাশ পায়।

তিনি ছোট বড় সকলের সঙ্গে অন্তরের সহিত মিশতেন, তাঁদের অন্তরের সঙ্গে নিজের অন্তরের একাত্মতা অনুভব করতেন।

এই জীবনশিল্পীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম বলে সত্যিই আমরা গর্বিত। তাঁর মহাপ্রয়াণে দেশের ও দশের যে ক্ষতি হয়েছে তা অবর্ণনীয়। তাঁকে স্মরণ করা আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি মুখ্য কর্ত্তব্য।

শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন

সুলভ ভাণ্ডার

সকল প্রকার সাইকেল ও সাইকেল পার্টসের আদি প্রতিষ্ঠান।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

॥ শিক্ষিত বেকার সমস্যা ও তার সমাধানের পথ ॥

—দুলাল মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণে সারা বিশ্বের শিক্ষাবিদ্‌রা নূতনভাবে ভাবতে বসেছেন ছাত্রসমাজের বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ছাত্র-সমাজ নিয়ে ভাববার অবসর এখন আমাদের নেই, কারণ আমাদের দেশেই ছাত্র-সমাজের সামনে নানারকম সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে; তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে বেকার সমস্যা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিক্ষিতদের হার আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি, তবুও অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষিত-বেকারের সংখ্যা বেশি। এর কারণগুলি একবার পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। আমাদের দেশ একটি অর্থ নৈতিক অনগ্রসর দেশ এবং এই দেশের অর্থ-নৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হচ্ছে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিজ সম্পদের প্রতি অবহেলা। আমাদের দেশে পতিত জমির সংখ্যা প্রচুর এবং চাষ বাসের প্রণালী এখনও সেই প্রাচীনপন্থায় হয়ে আসছে। এর ফলস্বরূপ আমাদের শস্য-উৎপাদনের পরিমাণ অতি অল্প হচ্ছে। আমাদের দেশ যদি অধিক ফলনের জন্য নূতন-পন্থায় ট্রাকটার দিয়ে চাষ করে এবং অধিক-ফলনশালী সারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় নূতন নূতন সার প্রস্তুতকারক রাসায়নিক কারখানা খোলে তাহলে শিক্ষিত-বেকার সমস্যা ও খাদ্য-সমস্যা এই দুইয়েরই বেশ কিছু প্রশম হয়।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর গলদ আছে। চারিদিক থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছে যার ফলস্বরূপ আজকের যুগের ছাত্ররা অসৎ উপায় অবলম্বন করে পাশ করছে নামে মাত্র একটা 'ডিগ্রি' নেওয়ার জন্য; কারণ তারা ভালভাবে জানে এই ডিগ্রির কতটুকু দাম। কাজেই এই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। হিজি-বিজি যা খুসি না শিখিয়ে 'প্র্যাকটিক্যাল' শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা অতি অবশ্যই দরকার। বিশ্বের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশ তাই করেছে। এবং এ ব্যবস্থা চালু হলে এত শিক্ষিত-বেকার কিছুতেই থাকবে না।

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্যাণ্ডের

★★

সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম কার্ডের বিরাট সমাবেশ।

★

॥ পণ্ডিত প্রেস ॥

রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

॥ টেপ্-রেকর্ডার ॥

—ফজলুল হক

[এই টেপ্-রেকর্ডার গল্পটি গত ইং ১৮।৪।৭০ তারিখে মুর্শিদাবাদ নবাব কেল্লায় সৈয়দ নবাব জানী সাহেবের বাড়ীতে আয়োজিত বিরাট ধুমধাম "নবীদিবস" উপলক্ষে নিমন্ত্রিত জেলার গণ্যমান্য কবি-সাহিত্যিক-সম্পাদক-শিল্পী-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ও মহামান্যা সম্পাদিকা ও সাহিত্যিকা রবীন্দ্র স্নেহধন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথেয়তায় আমাদের "মুর্শিদাবাদ সাহিত্য চক্র" অধিবেশনে পঠিত। —লেখক]

পরেশের বিয়েতে অনেকে অনেক কিছু দামী দামী জিনিষ উপহার দিয়েছিল। মহানগরীর এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র অমল তাকে একটা টেপ্-রেকর্ডার উপহার দিয়েছিল। দেবার সময় বলেছিল—ফুলশয্যার রাতে সে যেন তার নববধূর সাথে কথোপকথনের রেকর্ড করে রাখে। পরে একদিন এসে বন্ধু অমল সেটা বাজাবে এবং শুনবে। বিচিত্র রুচির কথাও সে ভেবেছিল, যাই হোক—কথা যখন দিয়েই ফেলেছে অবশ্যই সেটা রেকর্ড করার কথা ভাবল পরেশ।

দূর দেশ থেকে বিয়ে করে এনেছে পরেশ করুণাকে। বাড়ীর চারিদিকে লোকজন। ঠাট্টা-পরিহাস সম্পর্কীয় ছেলে-মেয়েরা বাসর ঘরের চারপাশে কান খাড়া করে বসেছিল। ঠিক জমল না। করুণার সাথে সত্য সত্যই যে কথা হয়েছিল তা টেপ করতে ভুলে গিয়েছিল। করুণা ক্লান্ত হয়ে বুকের পাশে মুখ লুকিয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে মরার মতো ঘুমুচ্ছিল, ডাকবে ঠিক করল। কয়েকটা ঝিঁকুনীও দিল করুণা অচেতন। প্রাণ খুলে ঘুমুচ্ছে। এই বুঝি প্রথমবার শান্তির ঘুম এল। এর আগে অতীতে অনেকদিন ঘুমুতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিসের যেন একটা কম্‌তি উপলব্ধি হোত।

পরেশ এর ঘুম আসছিল না কিছুতেই। নরম ধপ্‌ধপে বিছানাটায় যেন হাজার হাজার কাঁটা বিছানো। অসহ্য লাগছিল। মাথার উপরে সিলিং ফ্যান্‌টা সমানে চল্‌ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় কষ্ট হবার নয়। তথাপি.....

টেবিল ল্যাম্পের স্যুইচ্‌টা অন্ করে জ্বালিয়ে নিল ঘরটা। বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে এল। সোজা ট্রাঙ্কটার পাশে যত্ন করা যন্ত্রটা টেনে বের করল। ওতে ব্যাটারী জুড়ল। পিক্ আপ্‌টার সাথে মাইক্রো-ফোনটা হাতে ধরল। চালিয়ে দিল যন্ত্র। রেডি.....।

প্রায় দশ বছর অতীতে চলে গেল পরেশ। ছন্দা নামে এক সুন্দরীকে পরেশ ভালবেসেছিল। বাগদত্তা প্রেমিকা। অসবর্ণ বিবাহে বাড়ীর মতামত না থাকায় পিছিয়ে এসেছিল ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

পরেশ প্রায় ওদের বাসায় যেত। ছন্দা ওর কলেজ জীবনের বান্ধবী। কৃতি ছাত্রী। দেখতেও খুব সুন্দরী ছিল। আধুনিকতাও কম ছিল না। কলেজের অন্যান্য বন্ধুরা পরেশকে বলত ভাগ্যবান।

কলেজের সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠছে দোতালায়। পরেশ চিম্‌টি কেটে দিল একটা।

—উঃ, ভুত একটা।

—ভুত হব কেন। মানুষ।

—না, মোটেই না; দস্যু। দানব। নিষ্ঠুর।

হোঃ হোঃ করে হেসে দিল সশব্দে। দূরে নীচে পরেশের বন্ধু নিখিলেশ টোণ্ট করল—চিনের ড্রাগন। পিছু ফিরল। ততক্ষণে তুখোড় বন্ধু নিখিলেশ ভেগেছে। ছন্দা একটু বিরক্ত হোল—

—দূর, তুমি নির্লজ্জ।

—কখ্‌খনো না। আমি না দস্যু। দানব। নিষ্ঠুর। একটু এগোল।

—যা, এখানে নয় লক্ষ্মীটি। বাড়ীতে।

—ও বাব্বা, তোমাদের ঐ জেলখানায়। ওখানে তো সব সময় লোক।

—তা হোক্। কলেজ থেকে সোজা আমাদের বাসায়। কেমন? তাজা কফি খাওয়াব। মুখে চুক্‌চুক্ করে একটা মিষ্টি শব্দ করে পরেশ বলল—

—দেবে একটা।

—দেব বাবা দেব। একটা নয়। অনেক। আবেগ ভরা সম্মতি।

—খবরের কাগজ পড়ে বুঝি রেকর্ড ভাংতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঐ যে দু'জন তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীরা কি যেন এক নাগাড়ে ক'ঘণ্টা ধরে উপর্য্যুপরি চুমু দিয়ে আলোড়ন তুলেছে।

—তোমার যত সব কাব্য। কবিতা লিখে লিখে তুমি দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছো।

—কবিতা নয়, গল্প। তাজা প্রেম কাহিনী।

—ও বাব্বা, তুমি আবার গল্পও লিখছ নাকি! চয়েস পাল্টেছে দেখছি।

—এই, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবে।

—হুঁ।

—কি গল্প?

—প্রেমের।

—কাল্পনিক।

—না বাস্তব।

—প্লটটা শোনাবে।

—এখনও ঠিক করিনি।

—মানে!

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

—প্রথম সুরুর একটা লাইন বলো ত? ক্লাশের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়'ল দু জনায়। পরেশের গাটা ছম্‌ছম্ করে উঠল। বল্ল—

—এই সেরেছে; এখন উপায়।

—ঘাবরে গেছে ছন্দা।—কি হ'ল, তুমি যে চম্‌কে উঠলে?

—ভাব এসেছে।

পূজোর উৎসবে গ্রহণ করুন আমাদের
সাদর অভিনন্দন।

ফোন ঃ রঘুনাথগঞ্জ—৪৩

রামকৃষ্ণ পাল

— পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী —

এজেণ্ট— ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড
বি, এন, ইলিয়াস এণ্ড কোং লিমিটেড

INDIAN-OIL

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

প্রদীপ মার্কা
মিশ্র
সার

সকল প্রকার বনিয়াদী মশলা, চিনি, তৈল, খইল, ভাইল ইত্যাদি পাইকারী বিক্রেতা এবং সকল প্রকার জমির সার সরবরাহকারক।

কেরো
সিন
তৈল

—মরণ আর কি। ভাব আনানোর জায়গা পেলে না। কলেজে ভাব। চুরি যাবে।

—সত্যই বল্‌ছি ছন্দা, চল, একটু মাঠে যায়। পকেটে হাত দিয়ে বল্ল,—দু'টো টাকা আছে।

—বেশ।

—ক্লাশ ছেড়ে পালায় মাঠে। বেলা তিনটা। মাঠে ঘাসের উপর বসল ওরা। কলেজের খাতাটা এগিয়ে দিল ছন্দাকে। পেনটা উঁচিয়ে বল্ল—

—লেখ লেখ। হরি আপ্‌। জল্‌দি। মুড্‌ এসে গেছে। তাড়াতাড়ি লিখবে কিন্তু। নচেৎ .....পালাবে পরেশ বলে চলেছে—ছন্দা লিখে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বহু কথা মিস্‌ হচ্ছে। পরেশ ভাবে গদগদ।

তুমি আমার কাব্য। তোমার পটল চেরা চোখে আছে জ্যোতি। প্রেমের জ্যোতি। মনের অব্যক্ত আশার বহ্নিশিখার তেজমাখা জ্যোতি। আমি তোমায় ভালবাসি। তোমার চালে-চলনে-বলনে আমার সবুজ মন খুঁজে পেয়েছে একটা ছন্দ। সুরের ঝংকার শুনে আমার মনোবীণায় টান পড়ে। তুমি-আমি এক হয়ে বেঁচে থাকব। গাইব প্রেমের অমল কবিতা। সপ্তডিঙায় চড়ে মেঘনা-যমুনা-পদ্মার আকাশ-পাতাল ফাটাব। স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত জল রাশির মধ্যে ভাসিয়ে দেব আধভাঙ্গা কলাগাছের ভেলা। জল উঠবে। ডুবু ডুবু হবে,সে সখের তরী। তোমার কপাল বেয়ে কুন্তলরাশি উড়ু উড়ু করে ছুটে বেড়াবে দিক্‌-দিগন্তে। উড়বে বাতাসে। আমি দেখব। ক্ষুধার্ত্তের মতো ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব তোমার নিষ্পাপ দেহের উপরে। নিবেদন করে চাইব ভিক্ষা। জানি, তুমি সতী। দেহদানের কথা তুলে আমরা মিছামিছি অলৌকিক পাপ কর্ম্মকে জাগ্রত করব না। সবুর করে অপেক্ষা করব। বিয়ে হবে। বাসর সাজাব। বৈধভাবে আমরা একে অপরে নিয়ে সুখভোগ করব। তুমি কোনদিনই ভাবতে পারবে না—আমি অসৎ মানুষ। তোমার কথা ও কাজের সেই মহাদস্যু। ঠান্‌দির ঝুলিতে পাওয়া দৈত্য-দানব নয়। নর হত্যাকারী নিষ্ঠুর শয়তানও আমি নই। তুমি আমাকে আদর্শ পতি হিসাবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে। হয় তো আমার অবর্ত্তমানে তুমি আমাকে নিয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেক অবিবেচককে শোনাবে উপদেশাবলী। তোমার উপযুক্ত গর্ব্বের বস্তু স্বামী হব আমি। তোমাকে আমি চাইব—অবশ্যই চাইব।

কতদিন ধরে তোমাকে আমি একলা চাইছিলাম। এর প্রয়োজন ছিল ঢের। মনের সাথে কত কথা যে বলেছি ছন্দা, তুমি শোননি সে কথা। আজ শোন। প্রাণ ভরে শোনাতে পেরেছি। কি আনন্দ! কি সুখ! কি আমার অনুভূতি। একেই বলে কাব্য। একেই বলে গল্প। এই-ই হ'ল সার্থক সৃষ্টির ছন্দ। তুমি ছন্দা। আমি কবি। তুমি ভাবাও আর আমি কেবলই ভাবি। তোমার মানসরাজ্যে আমি আশার আলো মাত্র। তাই এই কবিচিত্তে তোমার-আমার এ গোপন মেলামেশা কখনও দোষণীয় নয়। অশোভনও নয়। অহেতুকও নয়। চেয়ে দেখ ছন্দা—আমার মুখের দিকে, এক মুহূর্ত্ত তুমি নিঃস্বার্থভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ, একটুখানি ধৈর্য্য ধরে তুমি তোমার সোনালী কানটা আমার জ্বালাময়ী বুকটার উপর রেখে শুন্‌তে চেষ্টা কর, বুঝবে, আমার হৃদয় ঝটিকাবার্ত্তার ঘূর্ণিঝড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আমার মনের অতলে কি সুর বাজছে। তুমি শুনবে না। শুন্‌তে পাবে না। আমি তাই প্রাণ খুলে শোনাচ্ছি এ কবিতা। কবিতা নয়, গল্প নয়, এটা তোমার পরেশের মানব গোপন দ্বারে কাঁদা যাচক পূজারীর করুণ আর্তনাদ। প্রেমই চেয়েছিলাম জীবনে। পেলেমও ঠিক; কিন্তু তুমি! তুমি কেন কথা বলছ না লক্ষ্মিটী! তুমি আজ আমার নীরব শ্রোতা। তাই না? বেশ, তাই সই। তুমি কেবল শুনে যাও। আমি গাইছি। নিষ্কলুষ মন নিয়ে বল্‌ছি। তুমি আমার কল্পনা, তুমি আমার মহাকাব্য। তুমি ছাড়া আমার আর কি আছে পৃথিবীতে।

ছন্দা। ওগো আমার সাধের ছন্দা, কবিতার ছন্দ। তুমি একটিবার হাসো। তোমার লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসুক ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি। ভারী সুন্দর। তোমার চোখের কোণে জল এল বুঝি। না, তুমি কাঁদছ। কেন,—আমি মরব না দেখে নিও। তোমাকে ছেড়ে আমার মরার ইচ্ছা হয় না ছন্দা। তোমার মা-বাবা, আর তোমার আভিজাত্যকে আমি জিই-এ রাখব। দূরে চলে যাব তোমাকে নিয়ে। গড়ব ছোট্ট একটা সাম্রাজ্য। তুমি হবে সেখানকার সম্রাজ্ঞী। আর আমি, হব সে রাজপ্রাসাদের দ্বাররক্ষক। তরবারি হাতে তোমাকে পাহারা দেব। তুমি ঘুমুবে, আমি জেগে জেগে কবিতা লিখব। তোমার ঘুমন্ত অবস্থা তো কোনদিন দেখিনি নিরালায়। তথাপি কল্পনা করছি—ছন্দা, তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে আরও ভাল লাগবে। তোমার নগ্নতা আমি দেখিনি। ছিঃ। ছিঃ। এ কী বাজে কথা ভাবছি। আমি তোমায় বিয়ে করব। বৈধ উপায়ে স্ত্রীতে পরিণত করব। তার পর .....ছন্দা।—এই দেখ আমি এখনও কত সুযোগ পাচ্ছি। এখানে স্রেফ তুমি আর আমি। তবুও আমি তোমার সে দস্যু হতে নারাজ। ফুল ছোব। কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করব না। তোমাকে ভেঙ্গে আমার কি লাভ! তোমাকে জীবন্ত রেখে সহস্র লাইনের কবিতা রচনা করব প্রতিদিন। পৃথিবীর লোক বুঝবে আমি স্বার্থক কবি। আমার কবিতা বাজারে সবাই লুফে নেবে। যেমন করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সম্পাদিত "ধুম্‌কেতু"র জন্য একদিন কোলকাতায় ফুটপাথে, মোড়ে, চৌমাথায়. ছেলে-বুড়ো-জোয়ান সবাই চেয়ে থাকত। আমার কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে থাকবে তুমি আর তোমার এই স্বচ্ছ মূর্ত্তি। আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় ভুলে যেও না। তাহলে একদিন পথে-ঘাটেই মরে পড়ে থাকব। আমার নিঃসার দেহ থেকে আওয়াজ ধ্বনিত না হলেও তোমার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে আমার অজস্র কবিতার ছন্দ।

ইস্ পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল! যাঃ, ফিতেটা থেমে গেল। এ টেপ্ এর মেয়াদ শেষ। খুব লজ্জা পেয়েছে পরেশ। ভাবল, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করল। তারপর……ড্রয়ারটা থেকে নিয়ে এল……।

ভোরে ঘুম ভাংতেই পরেশ এর জীবন সঙ্গিনী চেয়ে দেখল—টেপ্ রেকর্ডারটা আগোছাল করে টেবিলে ফেলে রেখে পরেশ খাটের নীচে ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই—করুণা ফেটে চিৎকার করে কেঁদে ফেল্ল। বিয়ে বাড়ীর হৈ-চৈ এবার কান্নায় রূপ পেল। পাশে 'ফলিডল' এর শিশিটা স্থবির হয়ে তাকিয়ে আছে পরেশের দিকে।

বন্ধু অমল খবর পেয়ে ছুটে এসে প্রথমতঃ অবাক হোল। সে ভাবল, সে কি আনন্দাশ্রু দেখছে, না দুঃখাশ্রু দেখছে। বাড়ীভরা লোক। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সজল নয়নে দাঁড়িয়ে। বন্ধু-পত্নী সদ্য বিধবাদশা করুণা অমলের পায়ের তলায় লুটিয়ে পরে আর্তনাদ করে উঠল—মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বল্ল—বলুন, আমার একী সর্ব্বনাশ হলো। আপনি ওঁর পরম বন্ধু।

ইন্সপেক্টর অনুরোধ করলেন—মিঃ অমলবাবু, বলুন। যা জানেন বলুন। অমল দিশেহারার মতো মৃত বন্ধু পরেশের পাশে বসে কিছু ভাবল। সন্দেহ বশতঃ আততায়ী সন্দেহে বাজিয়ে দিল বিষণ্ণ টেপ্-রেকর্ডারটা শুন্‌তে পেল বন্ধুর ফুলশয্যার মুখর কথোপকথনের পরিবর্ত্তে এক নির্ম্মম প্রেমের অপূর্ণাঙ্গ উক্তি। পাশে শোকার্ত্ত পরিবারের সাথে পরেশ এর বিধবা পত্নীর দুঃসহ চিৎকার।

———

সকলকে জানাই পূজার অভিনন্দন

* আই, সি, আই পেইন্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোং-র রং সুবিধা দরে পাইবেন।

বিক্রেতা ঃ—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ফোন নং বহরমপুর ২১৯

॥ সংস্কারের বেড়া ॥

—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

সংস্কারের বেড়াজাল পৃথিবীর সব দেশেই আছে। স্থান-কাল-ভেদে এই সংস্কারের রূপ বিভিন্ন। এক দেশে যাকে শুভদ্যোতক মনে করা হয়, অন্যত্র হয় ত সেটা অশুভসূচক। কিন্তু প্রচলিত সংস্কার রয়েছেই। বিজ্ঞানের পদযাত্রা যতই দৃঢ় হচ্ছে, মানুষ তাদের অন্ধ ধারণার প্রভাব হতে তত মুক্ত হতে পারেনি এখনও। অথচ প্রচলিত সংস্কার বা ধারণাগুলিকে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-চিন্তায় ফেলা যায় না কিছুতেই। খুব বেশী অতি-আধুনিক হলে বলে থাকি 'রেখে দাও তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দার বস্তাপচা অন্ধ কুসংস্কার, মানি না ও সব।' ঠিক, কিন্তু এহেন শ্রীমান্‌দেরও সময় সময় এমন কিছু মানতে হয়, যাতে করে ঐ কুসংস্কারের পাল্লায় তাদের একদিক দিয়ে পড়তে হয়ই। অবশ্য এটা ঠিক যে, যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কিংবা লক্ষণকে দেখে আমরা একটা কিছু হবে ভেবে নিই, এবং তার থেকে সংস্কারের জন্ম হয়, তার সব কিছু অশুভের দ্যোতক নয়। অমুকটা হলে ভাল হবে, অমুকটাতে খারাপ—এটা শুনে আসছি। কেন ভাল হবে বা কেন খারাপ তা জানি না। কিন্তু তবু সেগুলি মানতে দ্বিধা করি না। অন্ততঃ মুখে সাত বকুনি দিয়েও তাকে আমরা মেনে নিই। অজুহাত দিই—'গুরুজনে বলছেন, কি করি?'

হাঁচি পড়া, টিকটিকির শব্দ, কেউ পিছন হতে ডাকল—এগুলি আমরা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে চাই। আমরা মনে করি, এদের কুপ্রভাব আমাদের অবশ্যই ক্ষতি করে থাকে। কোথায় কুপ্রভাবটা, আর কেমন করে সে কুপ্রভাব আমাদের ওপর ক্রিয়াশীল হয়, আমরা তার ব্যাখ্যা করতে পারি না। সবাই বলে, হাঁচি একটা অশুভের সূচক—বিশেষ করে কর্মারম্ভে। কাজেই বড়রা কোন শুভকাজে বসলে বা কোথাও যাত্রা করছেন এমন সময় মেয়েরা ছোটদের নিয়ে ব্যস্ত হন যেন হাঁচি না পড়ে বা পিছনে না ডাকে। নাকি তা সব পণ্ড করে দেবে। এই ধারণা বহুদিন ধরে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ছোটরা হাঁচি ফেলার বেয়াদবিতে বড়দের হাতে কম নাকাল ভোগ করে না! কিন্তু মজাটা এই যে, হাঁচি একটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ায় নাসাপথে ময়লা বা ধোঁয়া ঢুকে একটা প্রদাহ কিংবা আক্ষেপের ভাব আনলে হাঁচি হয়। সর্দিতেও হাঁচি হয় জল ঝরার জন্যে। তবু শারীরবৃত্তের ব্যাপারটাকে মানুষ অন্যভাবে গ্রহণ করে কেন তার কোন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না।

কিছুদিন আগে এক ইংরাজী দৈনিকে হাঁচির সম্পর্কে অদ্ভুত সব ধারণার কথা পড়েছিলাম। মানসিক বিকারেব রূপভেদ মাত্র এই সব সংস্কারের মূল কাজ করছে। টিকটিকির 'টিকটিক' শুনে কর্মারম্ভের সময় আনে বিরক্তি। কাজটা বা যাত্রাটা একটু থেমে করতে হয়

গুরুজনদের কথায়। কোনও আলোচনার সময় সেই টিকটিকির শব্দটা-কেই স্বাগত জানানো হয়। হাতের আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে তিনবার টোকা মেরে কপালে ঠেকান হয়; অর্থাৎ যা বলছি, তার সত্যতা মিলেছে। খনার বচনে বলে যে মা যদি পিছন থেকে ডাকেন তবে সেটা শুভকর, অন্য কেউ হলে নয়। তেমনি খালি কলসী দেখার ব্যাপারটিও শুভাশুভের নির্ণায়ক। তাছাড়া, আরও কত ক্রিয়াকলাপ যে আছে! শিশুকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার আগে হাতের কড়ে আঙ্গুল কামড়ে দেওয়া হয়, অথবা তার বুকে মা থুথু দেন আর কপালে দেন গোবরের টিপ যাতে করে কোন মন্দ শক্তি শিশুর ক্ষতি করতে না পারে।

আগেই বলেছি আমরা বাঙ্গালীর হাঁচি ফেলাকে কর্মারম্ভের পক্ষে শুভকর মনে করি না। তাই তজ্জনিত দোষ কাটানোর জন্যে একটু থামতে হয়। আগে ভারতবর্ষে ঠগী দস্যুদের উৎপাত ছিল। শোনা যায় যে, তারা শিকার ধরবার সময় হাঁচি পড়লে শিকার ছেড়ে দিত। বেচারা তখন ইষ্টনাম জপ করতে করতে প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পেত না। সংস্কার মেনে চলেন এমন সব খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হাঁচি পড়লে আজও বলে থাকেন—'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' আর হাঁচলে পরে ক্রশচিহ্ন আঁকার ত একটা প্রথাই ছিল। জার্মাণদের ধারণা—জুতো পরতে হাঁচি পড়া খুব অশুভ লক্ষণ; তবে কোন বিবৃতি দেওয়ার সময়ে হাঁচি নাকি ঐ বিবৃতির সত্যতা প্রমাণ করে। এস্তোনিয়ার দুটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক একসঙ্গে হাঁচলে মনে করা হয় দু'জনেরই মেয়ে সন্তান হবে, আর তাদের স্বামীরা যুগপৎ হাঁচলে পুত্রসন্তান হবে। এরকম যোগাযোগ তেমন হত কিনা কে জানে?

জ্যামাইকা দ্বীপে যে নিগ্রোদের বাস, তারা মনে করে যে, হাঁচি পড়লেই কেউ তাদের নিন্দে করছে। চমকপ্রদ উত্তর ক্যারোলিনা সম্পর্কে। সেখানে হাঁচিকে কারও মৃত্যুর বার্তাবাহক মনে করা হয়। আমাদের মতই টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের লোকে হাঁচি পড়লে যাত্রা বন্ধ রাখে। অতি প্রাচীন কালে পারস্যে মনে করা হত যে, হাঁচি পড়লেই কোন দুষ্ট শক্তি দেহ হতে বেরিয়ে যাচ্ছে; তাই যাঁরা সেখানে উপস্থিত থাকতেন, হাত তুলে ঐ ভূতের প্রতি প্রার্থনা জানাতেন—'আর যেন এসো না'। নিউ গিনিতে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাঁদের দলপতি হাঁচলে তাঁর অনুগামীরা সর্দারের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করতেন। আগের দিনে গ্রীসে হাঁচিকে দেবানুগ্রহ ধরা হত। আর মধ্যাহ্ন হতে

॥ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা ॥

সে যুগে

কাঁদছ কেন লক্ষ্মী আমার?
বল কিবা বায়না,
কোন শাড়ী চাও পূজার দিনে
কোন প্যাটার্ণের গয়না।

এ যুগে

কাপড়, সোনার দাম—
বেড়েছে কি বাড়েনি
সেই সব হিসাবেতে কিবা মোর প্রয়োজন
এবার পূজায় চাই,
সবসেরা টেরিলিন,
তা' না হলে বিষ পানে তেয়াগিব এ জীবন।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হাঁচি ছিল শুভকর; কিন্তু অন্য সময়ে সেটা খারাপ বলে ধারণা ছিল। থাইল্যাণ্ড দেশে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, দেবতারা মানুষের পাপপুণ্যের খতিয়ানের পাতা উল্টালে যার নামের পাতা বাহির হয়, সে তখন হাঁচে। তাই বলা হত, 'তাঁর বিচার তোমার শুভ করুন।' চৈনিক বিশ্বাসমতে নববর্ষের শুভদিনের হাঁচিতে বৎসরের বাকী দিনগুলি ভাল যাবে না। আর জাপানীরা ভাবেন, একটি হাঁচি পড়লে কেউ তার প্রশংসা করছে, দুটি পড়লে তাকে কেউ অভিশাপ দিচ্ছে কিন্তু তিন বা তার বেশী হাঁচি তার অসুখ আনতে পারে।

বিচিত্র দুনিয়ার বিচিত্র ধারণা। এক দেশের ধারণা অন্য দেশের পক্ষে কত হাস্যকর। কিন্তু এগুলোর মূলে আছে সংস্কারাচ্ছন্নতা। বাস্তব বুদ্ধিতে এর বিচার চলে না। যুগের পরিবর্তনে অন্ধধারণার নানা পরিবর্তন হয়। কিন্তু হাঁচির ব্যাপারে যতগুলি ধারণার কথা বলা হল, দেশ বিশেষে ও কাল বিশেষে এদের কোন কোনটি বা যে ফলাফল এনে দিয়েছিল, তার থেকেই হয় ত ওই সব ধারণা করা হয়েছে।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

আপনি কি কখন "পশ্চিমবঙ্গ" পত্রিকা পড়েছেন ?

সমগ্র পশ্চিম বাংলার গঠনমূলক কাজ কর্মের খবরাখবর এই পত্রিকায় পেতে পারেন। ছাত্র-শিক্ষক-কৃষক-অফিস কর্মী-কারখানার কর্মী সকলের পক্ষে উপযোগী এই পত্রিকা। পশ্চিম বাংলাকে জানতে হলে এই পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—আপনিও পড়ুন।

পশ্চিমবঙ্গ (সাপ্তাহিক) পত্রিকার চাঁদার হার—৫'০০ টাকা।
ষাণ্মাসিক হার—২'৫০ টাকা। ভি, পি-তে পাঠান হয় না।

যোগাযোগ করুন : তথ্য এবং জনসংযোগ বিভাগ
২৩নং আর এন মুখার্জী রোড, কলিকাতা—১

বিশদ বিবরণের জন্য জেলা বা মহকুমা তথ্য অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

* মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য বি—৩৩/৭০-৭১

কুকুরও নিহত !

—আশিস রায়

লোক মুখে সম্প্রতি একটা খবর পেয়ে ঘাবরে গেলাম—বোমার আঘাতে তিনটে কুকুর নিহত হয়েছে !

সংবাদটা যতই চমকপ্রদ হোক্, শেষ পর্যন্ত ভাবতে গেলে অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং ছবি পোড়ানো কিংবা মূর্ত্তিভাঙার যে সব গুরুতর ঘটনা ইদানীং ঘটছে তার তুলনায় তিনটে কুকুর খতম করার ঘটনা অতীব জলবত্তরলং ব্যাপার। তাছাড়া যখন পাঁচ টাকার কার্তুজ দিয়ে ছটাকখানেকের ঘুঘু শিকার করছি, হাজার কয়েক টাকা খরচ করে (এই দুর্মূল্যের বাজারে বড্ড বেশি !) মানুষও শিকার করছি কখনো সখনো, তখন বোমা দিয়ে কুকুর মারার ব্যাপারটা এমন কী আর বেশি ?

আসলে আমি ঘাবড়ে গিয়েছি অন্য একটা কারণে।

বিশ্বাস করুন, আমি সাধন ভজন জানি না, নামজপ করি না, নামাবলীও ব্যবহার করিনি কখনো। অথচ ইহজন্মে আমার বৈরাগ্য এসেছে। বেঁচে থাকতে গিয়ে চারদিকের ব্যাপার স্যাপার দেখে অসহ্য মনে হচ্ছে অনেক কিছুই। এক সময় ভেবেছিলাম অনর্গল কথা বলে বক্তৃতা দিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করে ভালো থাকতে পারব। কিন্তু দেখলাম তাতে সমূহ বিপদ। শুরু হল কানাকানি বিদ্রূপ টিটকিরি ইত্যাদি অনেক কিছুই। এ সব দেখে শুনে বিব্রত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কথা বলব না, চিঠি লিখব না, মুখ বন্ধ করে বোবা হয়ে থাকব। দেখলাম তাতেও মুক্তি নেই। লোকমুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল, আমি কবে আমার পড়ার ঘরে চারদিকের জানালা-দরজা বন্ধ করে গোপনে এক গ্লাস শরবৎ খেয়েছিলাম, কিংবা আমার বাড়ির তিনতলার ছাদে মাদুরে শুয়ে অত্যন্ত নিঃশব্দে আমি কবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

বেচারা কুকুর তিনটে মরেছে। খবরটা অনেকের কাছেই মুখরোচক কিন্তু আমার কাছে মর্মান্তিক। মর্মান্তিক এই কারণে যে সংসার-বৈরাগ্যের দশম দশায় পৌঁছে আমি কিছুদিন থেকেই ভাবছিলাম, দৈবে যদি রাস্তার কুকুর কিংবা ঐ পাগলটার মতো হয়ে যেতে পারতাম তবে বেঁচে যেতাম।

এখন দেখছি কুকুরও নিহত হয়। অতএব আর কিছু ভাবি না—শুধু অপেক্ষা ক'রে বসে আছি। নিশ্চয় জানি, একদিন খবর পাব, পথের পাগলটাকেও কারা বোমা মেরে খতম করেছে।

॥ সম্পাদকীয় ॥

॥ মাতৃপূজা ॥

আশ্বিনের শেফালী যখন শিশিরসিক্ত ঘাসের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে বিশ্বমাতৃকার চরণবন্দনার মানসে, স্নিগ্ধ প্রভাতবায়ুর হিল্লোলে রক্তপদ্ম অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়া জানাইল দেবীর আগমন বার্তা, শুনিলাম তখন চিরকালের মা মেনকা বলিতেছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল ;
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী
কোথা লুকাল।"

শিবশক্তি সাধনার পীঠভূমি বাঙ্গালী ভক্তহৃদয় অধ্যাত্মচিন্তায় দেবতাকে আত্মীয় জানিয়াই কন্যা, মাতারূপে দেবীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইনি সেই কন্যা যাঁহার জন্য মা বলেন—

"যাও যাও গিরি, আনিতে গৌরী
উমা কেমন রয়েছে ;
আমি যে শুনেছি নারদ-বচনে
মা—মা বলে উমা কেঁদেছে"।

আর সেই কন্যা রামপ্রসাদের বেড়ার দড়ি ফিরাইয়া দিতেছেন! এই মহাপূজা বাঙ্গালীর হৃদয়ের সঙ্গে, তার প্রতি নাড়ীর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা। জাতীয় জীবনের এই লোকোৎসব ষষ্ঠির সন্ধ্যা হইতে দশমীর বিসর্জ্জন পর্যন্ত। এই কয়েকটি দিন আমাদের সমস্ত দুঃখ-বেদনাকে নেপথ্যে রাখিতে চাই। চাই সেই ব্রহ্মময়ীর স্নেহস্পর্শ—যা শুধু উপলব্ধির বস্তু। দেবীকে 'পুনরাগমনায় চ' বলিয়া আবার দুঃসহ দুঃখভার মাথায় তুলিয়া লই।

'যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী
যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী
যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী
যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্ত্তিসহিতা
মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥'

মা অবতীর্ণা—দশপ্রহরণ তাঁহার দশ হাতে। গণদেবতার প্রতীক সর্ববিঘ্নবিনাশক গণপতি দক্ষিণে আর সর্বসম্পদদায়িনী মহালক্ষ্মী, বামে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী মহাসরস্বতী এবং কৌমার্য-তারুণ্যোজ্জ্বল কার্তিকেয়। পদতলে শৌর্যরূপী মহাসিংহ এবং বিমর্দিত শত্রু মহিষাসুর। বেদতন্ত্র-যাগমন্ত্র অতিরেক এই মাতৃময়ী দেবী ভক্তহৃদয়ে মাতা-কন্যার নিত্য খেলায় মত্তা। সে খেলায় ক্ষণ-এর প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই শিশিরোদক, বরাহদন্তমৃত্তিকা, সপ্তসমুদ্রের জল প্রভৃতির। শারদীয়া পূজার মহাভাবটি যুগে যুগে পরিবর্তনের মাঝেও একই রূপে বিধৃত।

শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমাতা। ইনি ঋগ্বেদস্বরূপা, যজুর্বেদস্বরূপা ও সামবেদ-স্বরূপা। ইনি পরমাত্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকাশমানা। বস্তুতঃ এই শক্তিবাদসর্বত্র স্বীকৃত। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এই শক্তিবাদের তত্ত্ব মানিয়া লইয়াছিল। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে শক্তিতত্ত্ব দেখা যায়। সুদূর অতীতে নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ভারতবর্ষে শত শত রাজবংশের উত্থানপতনে, নানা রাজনীতির মহিমাপ্রচারে, নিতান্ত দৈন্যদশাতেও দেবীর প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিমতাটুকু আজ ট্রাডিশনের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আজ শক্তির এ কী অপচয়! রাজ্যব্যাপী রাজনীতির কূট-কৌশল। ছুরি-পিস্তল-বোমা-আগুন মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। লোভ আর অবিচার সমাজ জীবনে যে বিষ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার জর্জরজ্বালা নিত্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ মানুষকে যে অসহনীয় পরিস্থিতিতে আনিয়া দিয়াছে, তাহাতে এই মহাশক্তির পুনর্জাগরণ প্রয়োজন। দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপা ; তাই সন্তান রক্ষণে তিনি তৎপরা। তিনি বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বরূপা ; তিনি বিশ্বকে ধারণ করেন, পরিপালন করেন। তিনি মহারাত্রি অর্থাৎ মহাপ্রলয়রূপা। 'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী—মহামায়ার আহ্বান জানাই অন্তরের আকুতি দিয়া—'বুকের ব্যথায় আসন পাতা, বস মা এসে দুখদুলালী'। আর পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলি প্রদান করি দেবীর—মায়ের শ্রীচরণে—

'প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে'॥

'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের আমরা শারদোৎসবের যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

—সম্পাদক

দেবীর আগমনী সুরে
আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে

শরতের মেঘমুক্ত আকাশের নীচে কাশবন
আর সোনালী রোদের লুকোচুরি।

তাই এই সুন্দর-স্বচ্ছ শারদ প্রভাতে আপনাদের
আন্তরিক শুভেচ্ছা—আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক।

আপনাদের সেবায় ও পরিতৃপ্তি দানে

বামাপদ চন্দ্র এণ্ড সন্স

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানীর সিগারেট

ও

ব্রিটেনিয়া বিস্কুট কোম্পানীর

মহকুমার একমাত্র পরিবেশক

Registered No. C. 853

৫৭শ বর্ষ — ২১শ সংখ্যা শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ

শারদীয়া উৎসবে জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাম—ত্রিশ পয়সা

৺পূজায় আপনাদের সাদর-সম্ভাষণ জানাই।

কেনারাম চন্দ্র এণ্ড সন্স

প্রাচীন ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

* রঘুনাথগঞ্জ এবং উমরপুর-এ সব রকম সার পাওয়া যায়।

শারদীয় সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত